কোন্ সে দেশের কোন্ সাগরের পারে

রুশ কথাশিল্পীদের রচিত রূপকথা

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

কোন্ সে দেশের কোন্ সাগরের পারে

রুশ
কথাশিল্পীদের
রচিত
রূপকথা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

অঙ্গসজ্জা: ওলেগ করোভিন

ЛУКОМОРЬЕ

Сказки русских писателей

На языке бенгали

ON SEASHORE FAR A GREEN OAK TOWERS

(A Book of Tales)

In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত

Л $\frac{4803010101-126}{031(05)-86}$ 099–86

ISBN 5-05-000729-1

এই গ্রন্থে সংগৃহীত রূপকথাগুলি লিখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট রুশ লেখকবৃন্দ। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন মহা কবি আলেক্সান্দর পুশকিন, ভাষাতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানী, সামরিক চিকিৎসক ভ্লাদিমির দাল্ — যিনি বহুবার রাশিয়া ঘুরেছেন, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ভ্লাদিমির অদয়েভস্কি, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কন্স্তান্তিন উশিন্স্কি এবং আরও অনেকে। অন্যান্য জাতির রূপকথার প্রতি রুশ লেখকদের অপরিসীম আগ্রহ ছিল! মিখাইল লেরমন্তভ ককেশীয় মহাগাথার ভিত্তিতে শিশুদের জন্য রূপকথা রচনা করেন, লেখক, পর্যটক ও ইঞ্জিনীয়র নিকোলাই গারিন কোরীয় রূপকথার আশ্রয় নেন, লেভ তলস্তয় ও আলেক্সান্দর কুপ্রিন প্রাচ্যদেশীয় প্রাজ্ঞতার নিদর্শন দিয়ে রূপকথা রচনা করেছেন। এই সমস্ত রূপকথার বিষয়বৈচিত্র্য যতই থাক না কেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সত্য ও কল্যাণ, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা।

আলেক্সান্দর পুশকিন

রুস্‌লান ও ল্যুদ্‌মিলা

(কাব্যাংশ)

কোন্ সে দেশের কোন্ সাগরের পারে
সবুজ বরণ কল্পতরু, সোনার শিকল তাতে।
পরম জ্ঞানী বিড়ালমশাই কল্পতরুটারে
শিকল-বাঁধা পাকে পাকে ঘুরছে দিনে রাতে।
ডান দিকেতে শিকল জড়ায় — হাজারো গান সাধে,
বাম দিকেতে ঘুরে ঘুরে রূপকথা সে বাঁধে।

আজব সে দেশ: বনের দানো ঘুরছে ধারে কাছে,
মীনকুমারী গাছের ডালে দেখবে বসে আছে।
সৃষ্টিছাড়া সেইখানেতে চলতে পথে ঘাটে

নাম না জানা জন্তু — তাদের চিহ্ন পড়ে চোখে।
আছে কুটির— মোরগ-ঠ্যাঙের ওপর খাড়া ঠাটে —
জানলা-কপাট-দুয়ার ছাড়া — অবাক মানে লোকে।
অরণ্যে আর উপত্যকায় দৃশ্য সেথায় কতই না —
ভোরের আলোয় পড়ছে ভেঙে, করছে আনাগোনা
বালুর বেলায়, শূন্য পারে তরঙ্গদল মেলা।
সাগরতলার আদ্যিবুড়োর নিত্যনূতন খেলা:
দেড় কুড়ি বীর, চোখ জুড়ানো, তাক লেগে যায় দেখে —
টলটলে জল ভেদ করে সব উঠল একে একে।
রাজার কুমার চলতে গিয়ে পথে খেলার ছলে
প্রবল প্রতাপ সম্রাটেরে বন্দী করে আনে।
সেই দেশেতে লোকজনেরা দেখছে মেঘের কোলে
অরণ্য আর সাগর 'পরে কোন্ সুদূরের পানে
বীরপুরুষে কোন্ মায়াবী বইছে মায়ার বলে।
রাজকুমারী কাঁদছে অঝোর অন্ধ কারাগারে,
বাদামী রঙ নেকড়ে এসে করছে সেবা তারে।
ডাইনী বুড়ি শূন্যিপথে হামান্‌দিস্তা চড়ে
দিব্যি দেখ খোশমেজাজে তরতরিয়ে ওড়ে।
স্বর্ণরাশির স্তূপের 'পরে ধুঁকছে পিশাচ-রাজা;
রুশ মাটি আর রুশ মানুষের গন্ধ যে পাই তাজা!
সেথায় আমি পান করেছি মধুর সুরা মাধ্বী,
তাইতে আমার কল্পতরু দেখার হল সাধ্যি।
সাগরপারে বসতে আমি তরুর ছায়াতলে
বিড়ালমশাই রূপকথা সব আমায় গেল বলে।

সের্গেই আক্সাকভ

আলতা জবা

সে অনেক কাল আগেকার কথা। কোন এক রাজ্যে, কোন এক দেশে ছিলেন এক ধনী-মানী সদাগর।

তাঁর ছিল অঢেল ধনদৌলত, সাগরপারের দামী দামী জিনিস, হীরে-মুক্তো, জহরত, সোনাদানা আর রুপোর ভান্ডার। আর ছিল সেই সদাগরের তিন মেয়ে — তিনটিতেই রূপের ডালি, তবে সবার সেরা — ছোট মেয়ে। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদের চেয়ে — মণি-মুক্তা-মানিক আর সোনা-রুপোর ভান্ডারের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন তাঁর মেয়েদের; ভালোবাসতেন এই কারণে যে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন, আর এমন কেউ ছিল না যাকে তিনি ভালোবাসতে

পারেন। বড় দুই মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু ছোটটিকে বেশি ভালোবাসতেন, কেন না সে ছিল সবার চেয়ে সুন্দরী আর বাপের সবচেয়ে নেওটা।

সেই সদাগর সাত সমুদ্দুর, তেরো নদী, সাত রাজার রাজ্যি আর তেপান্তর পেরিয়ে বাণিজ্যে যাবেন। যাবার আগে তিনি তাঁর মিষ্টি মেয়েদের বললেন:

'আমার লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়েরা, আমি বাণিজ্যে চললাম, তোমরা আমাকে ছাড়া ভালোভাবে, লক্ষ্মীটি হয়ে থেকো, আমি তোমাদের জন্যে উপহার নিয়ে আসব—যে যেমন চাও। তিন দিন ভাবার সময় দিলাম, তারপর আমাকে বলবে তোমাদের কার কী উপহার চাই।'

তিন দিন তিন রাত ধরে তারা ভাবল, তারপর বাপের কাছে এলো। বাপ তাদের জিজ্ঞেস করলেন কে কি উপহার চায়। বড় মেয়ে বাপকে গড় করে প্রথমে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! সোনা-রুপোর জরিতে কাজ নেই, মেরু-নকুলের চিকণ-কালা চামড়াতে কাজ নেই, আঁখির সমান মুক্তো—তা-ও নয়। আমার জন্যে মণি-মানিক গাঁথা সোনার মুকুট এনো। তাতে যেন থাকে এমন সব মণি-মাণিক্য, যেখান থেকে ঠিকরে বেরোয় জোছনার আলো, রাঙা সুয্যির আলো, আর সে আলোয় মিশমিশে রাত যেন দিনদুপুরের মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে।'

ভালোমানুষ সদাগর একটু ভেবে বললেন:

'ভালো কথা গো, লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়ে, এমন মুকুট আমি তোমায় এনে দেব; তা আছে সাগরপারের এক রানীর কাছে, কিন্তু লুকানো আছে পাথরে গড়া ভাণ্ডারে, সেই ভাণ্ডার আবার আছে কঠিন শিলার পাহাড়ের ভেতরে তিন তিনটে লোহার ফটক আর তিন তিনটে পেল্লাই কুলুপের আড়ালে। কাজটা তেমন সহজ নয়, তবে আমার ধনদৌলতের কল্যাণে কোন বাধাই বাধা নয়!'

মেজো মেয়ে তাঁকে গড় করে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! সোনা-রুপোর জরিতে কাজ নেই, মেরু-নকুলের চিকণ-কালা চামড়াতে কাজ নেই, আঁখির সমান মুক্তো দিয়ে মালা, মণি-মানিক গাঁথা সোনার মুকুট—তা-ও নয়। আমার জন্যে এনো আরশি—পুব দেশের স্ফটিকের আস্ত, নিখুঁত আরশি। তাতে তাকালেই যেন আমি দেখতে পাই ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য, আর তার দিকে তাকালে এমন হবে যে আমার বয়স বাড়বে না, আমার কাঁচা বয়সের রূপ আরও বাড়তে থাকবে।'

ভালোমানুষ সদাগর ভাবনায় পড়লেন, একটু ভেবে তাকে এই কথাগুলো বললেন:

'ভালো কথা গো, লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়ে, এমন স্ফটিকের আরশি আমি তোমাকে

এনে দেব; তা আছে পারস্যদেশের রাজকন্যের কাছে, লুকানো আছে উঁচু পাষাণগড়ে, কুঠুরির ভেতরে, কঠিন শিলার পাহাড়ের ওপরে, সাত সাতটা লোহার ফটক আর সাত সাতটা কুলুপের আড়ালে। পাষাণগড়ের সেই ফটকে যেতে গেলে পেরোতে হয় তিন হাজার সিঁড়ি আর প্রত্যেকটি সিঁড়িতে দিন রাত খাড়া আছে খোলা ইরানী তলোয়ার হাতে একেকটি ইরানী যোদ্ধা। ঐ লোহার ফটকগুলোর চাবির গোছা থাকে রাজকন্যের কোমরের তাগায়। তোমার কাজটা তোমার বোনের দেয়া কাজের তুলনায় খানিকটা শক্ত বটে, তবে আমার ধনদৌলতের কল্যাণে কোন বাধাই বাধা নয়।'

ছোট মেয়ে বাপকে গড় করে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! সোনা-রুপোর জরিতে কাজ নেই, মেরু-নকুলের চিকণ-কালো চামড়াতে কাজ নেই, আঁখির সমান মুক্তোরাশির মালা, মণির মুকুট, স্ফটিকের আরশি— এর কোনটাই নয়। আমার জন্যে এনো আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল এই দুনিয়ায় নেই।'

ভালোমানুষ সদাগর এবারে আরও ভাবনায় পড়লেন। বেশ করে ভাবনাচিন্তা করলেন, তারপর আদরের ধন ছোট মেয়েকে চুমো খেয়ে, আদর করে বললেন:

'তা তুমি আমাকে যে কাজের ভার দিলে সেটা তোমার বোনদের দেয়া কাজের চেয়ে ঢের শক্ত। কী খুঁজতে হবে জানা থাকলে খুঁজে বার করা যায়, কিন্তু যা নিজেরই জানা নেই তার খোঁজ পাব কোথা থেকে? আলতা জবা বার করা আর এমন কি কঠিন? কিন্তু কী করে জানব যে দুনিয়ায় তার চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল নেই? চেষ্টা করব, কিন্তু উপহার তেমন না হলে রাগ করো না।'

ভালোমানুষ সদাগর ত তাঁর লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে এলেন তাদের যার যার খাস কামরায়। সাগরপারের দূর দূর রাজ্যে যাবার পথে নামার তোড়জোড় করতে লাগলেন তিনি। এই তোড়জোড়ের পেছনে তাঁর কত কাল, কত সময় গেল আমার জানা নেই, আমার জ্ঞানের বাইরে—বলতে গেলে ত অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। তিনি পথ ধরলেন, যাত্রা করলেন।

ভালোমানুষ সদাগর ঘুরতে থাকেন সাগরপারের ভিন দেশে, দেশ থেকে দেশান্তরে, অচিন রাজাদের রাজ্যে রাজ্যে। নিজের পসরা তিনি বেচেন সোনার দামে, পরের পসরা কেনেন জলের দরে; পসরার বদলে পসরা নেন, আবার তার ওপর নেন যথেষ্ট পরিমাণে সোনারুপো; সোনার ভাণ্ডারে জাহাজ বোঝাই করেন, দেশে পাঠান। খুঁজে বার করলেন বড় মেয়ের সাধের উপহার— সেই মুকুট, তাতে এমন সব মণি-মাণিক্য যাদের আলোয় মিশমিশে রাত দিনদুপুরের মতো ঝকঝক করে। খুঁজে বার করলেন মেজো মেয়ের সাধের উপহার—স্ফটিকের আরশি,

তার ভেতরে দেখা যায় ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য, আর তার দিকে তাকালে কাঁচা বয়সের রূপ বুড়োয় না, বরং আরও বেড়ে যায়। কেবল খুঁজে পান না তাঁর আদরের ধন ছোট মেয়ের সাধের উপহার আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল এই দুনিয়ায় নেই।

বহু রাজা-রাজড়া আর সুলতানদের বাগিচায় তিনি এমন এমন আলতা জবা দেখলেন যাদের রূপের বর্ণনা কথায় বলে বোঝানো যায় না, কলমে লেখা যায় না। কিন্তু কেউই তাঁকে হলফ করে বলতে পারে না যে দুনিয়ায় তার চেয়ে সুন্দর ফুল আর নেই। তাছাড়া তাঁর নিজের মনও সায় দেয় না। তিনি তাঁর বিশ্বাসী অনুচরদের নিয়ে চলেছেন পথে পথে, ঝুরঝুরে বালি আর ঘন জঙ্গল ভেদ করে। এমন সময় কোথা থেকে যেন তাঁর ওপর হামলা করল ডাকাতের দল। বিপদ এড়ানোর কোন উপায় নেই দেখে ভালোমানুষ সদাগর উটের সারি বোঝাই ধনদৌলত আর বিশ্বাসী অনুচরদের ছেড়ে অন্ধকার বনের ভেতরে ছুটে পালালেন। ভাবলেন: 'বন্দী হয়ে পরের অধীনে বাকি জীবনটা কাটানোর চেয়ে ভয়ঙ্কর জন্তুজানোয়ারেরা যদি আমাকে ছিঁড়ে ফেলে তা-ও ভালো।'

সেই ঘন দুর্গম বনের ভেতরে তিনি ঘুরতে থাকেন, যত দূরে যান ততই পথ ভালো হতে থাকে, যেন তাঁর সামনে থেকে গাছপালা সরে গিয়ে পথ করে দেয়, ঘন ঝোপঝাড় ফাঁক হয়ে যায়। পিছন ফিরে দেখেন—হাত গলানোর মতো ফাঁক নেই, ডান দিকে চেয়ে দেখেন—গুঁড়ি আর কুঁদো; টেরাচোখ খরগোসের সাধ্যি কি সেখান দিয়ে লাফিয়ে পালায়, বাঁ দিকে চেয়ে দেখেন—গতিক আরও খারাপ। ভালোমানুষ সদাগর ত অবাক। ভেবে কূল পান না এ কী আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা ঘটছে। ভাবতে ভাবতে তিনি চলছেন ত চলছেনই। তাঁর পায়ের নীচের পথ সমান। সকাল থেকে সাঁঝ অবধি চলতেই থাকেন, জন্তুজানোয়ারের গর্জন, সাপের ফোঁসফোঁসানি, পেঁচার চেঁচানি, পাখির কাকলি—কিছুই শুনতে পান না। তাঁর আশেপাশে সব যেন নিঝুম। দেখতে দেখতে রাতের আঁধার নেমে এলো; চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার, অথচ পায়ের নীচে আলোয় আলো। প্রায় মাঝরাত অবধি এই ভাবে চলার পর তিনি দেখতে পেলেন সামনে যেন ভোরের সিঁদুরে আভা, ভাবলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে বন জ্বলছে, তাহলে আর ওদিকে, নিশ্চিত মরণের পানে যাই কেন?'

তিনি তখন পিছনে ফিরলেন। যেতে পারলেন না; ডাইনে, বাঁয়ে — তাও না; সামনে এগিয়ে গেলেন—দিব্যি পথ। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, 'না, বরং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষাই করি—এই সিঁদুরে আভাটা অন্য দিকে সরে গেলেও যেতে পারে, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে, আবার একেবারে নিভেও যেতে পারে।'

সদাগর তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কিসের কী?—ঐ সিঁদুরে আভাটা যেন ঠিক তাঁকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে, যেন তাঁর ধারেকাছে সমানে ফরসা হয়ে

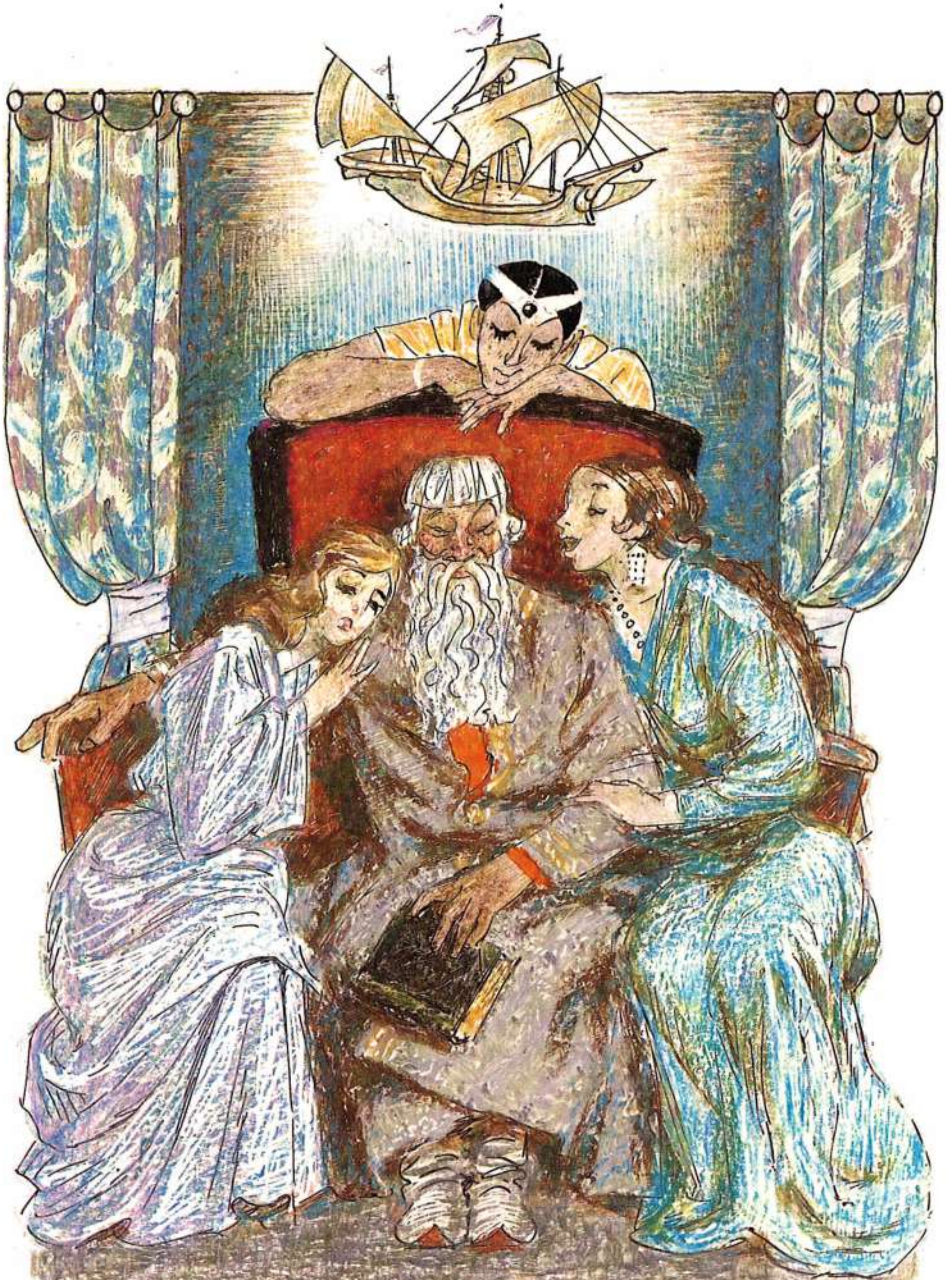

আসতে থাকে। ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন সামনেই এগিয়ে যাবেন। মরণ ত আর দু'বার হয় না; আর একবার যে মরণ আছে তাকে খণ্ডায় সাধ্যি কার? ভগবানের নাম করে এগিয়ে গেলেন সদাগর। যত দূরে যান ততই ফরসা হতে থাকে, প্রায় দিনের মতো ফটফটে, অথচ কোন আওয়াজ নেই, আগুন জ্বলার পট্‌পট শব্দও নেই। শেষে বেরিয়ে এলেন বনের ভেতরের এক বিশাল ফাঁকা জায়গার মাঝখানে। দেখলেন সেখানে যা দাঁড়িয়ে আছে সেটা বাড়ি অথচ বাড়ি নয়, অট্টালিকা অথচ অট্টালিকাও নয় — এক প্রাসাদ, রাজা-রাজড়ার পুরী — আগাগোড়া আগুনে, সোনা-রুপোয় আর হীরে-জহরতে ঝলমল করছে। আগাগোড়া দাউদাউ করছে, ঝলমল করছে, অথচ আগুনের দেখা নেই; ঠিক যেন টুকটুকে সূয্যিটি, তাকালে চোখ টাটায়। রাজপুরীর সব জানলা দরাজ খোলা, ভেতরে মিঠে সুরে বাদ্যি বাজছে, এমন বাদ্যি তিনি কখনও শোনেন নি।

সদাগর ত এসে ঢুকলেন বিশাল আঙ্গিনায়, চললেন ইয়া চওড়া হাঁ-হাঁ খোলা সিংদরজা পেরিয়ে। সাদা মর্মরপাথরে বাঁধানো পথ চলে গেছে, পথের দু'পাশে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে — উঁচু, বড়, ছোট — কত রকমের ফোয়ারা! সিঁড়ি দিয়ে তিনি উঠতে থাকেন রাজপুরীতে। সিঁড়িতে লাল টকটকে মিহি বনাত বিছানো, সিঁড়ির হাতল সোনালি। রাজপুরীর ভেতরে ঢুকলেন, ঢুকলেন এক কুঠরীতে — কেউ নেই, অন্য কুঠরীতে, আরেক কুঠরীতে — কেউ নেই; একে একে পাঁচ পাঁচটি কুঠরী, দশ দশটি কুঠরী ঘুরলেন — কোথাও কেউ নেই; তা হলে কী হবে, যে দিকে চোখ যায়, সাজসজ্জা রাজবাড়ির মতো — অমন কেউ কখনও শোনে নি, দেখে নি — সোনা-রুপো, পুব দেশের স্ফটিক, হাতি আর ম্যামথের দাঁতের ছড়াছড়ি।

অমন ধনদৌলতের কথা মুখে বলে শেষ করা যায় না। ভালোমানুষ সদাগর অবাক, আরও অবাক এই ভেবে যে বাড়ির কর্তা নেই; কেবল কর্তাই বা কেন, দাসদাসীও নেই; অথচ বাদ্যি বেজেই চলেছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন: 'সবই ভালো, কিন্তু খাবার কিছু নেই' — যেমন মনে মনে ভাবা অমনি তাঁর সামনে এসে হাজির ঝকঝকে-তকতকে টেবিল: সোনা-রুপোর বাসনে কত রকমেরই না মিষ্টি খাবার, ভিনদেশী সুরা আর মধুর সরবত। টেবিলের ধারে তিনি নিশ্চিন্তে বসে পড়লেন; ইচ্ছেমতো পান করলেন, পেট পুরে খেলেন, কেননা পুরো আট প্রহর তিনি কিছু খান নি। খাবার এমনই যে বলে বোঝানো যায় না — খেয়ে আর আশ মেটে না। বনেবাদাড়ে আর বালির ওপর হেঁটে হেঁটে তাঁর খিদেও পেয়েছিল খুব। খাওয়ার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু নমস্কার জানাবেন কাকে? আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদই বা জানাবেন কাকে? উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন খাবার আর টেবিলের কোন চিহ্ন নেই। বাদ্যি কিন্তু বেজেই চলেছে।

এই অদ্ভুতের ওপর অদ্ভুত কাণ্ড, আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য ব্যাপার দেখে ভালোমানুষ সদাগর

অবাক, তিনি নানা অলঙ্কারে সাজানো এ মহল ও মহল ঘোরেন, তারিফ করেন, আর মনে মনে ভাবেন: 'এবারে শুয়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে একচোট ঘুম দিতে পারলে তোফা হত'—অমনি দেখতে পেলেন সামনে এসে হাজির জাফরি কাটা, খাঁটি সোনার পালঙ্ক, তার পায়াগুলো স্ফটিকের, ওপরের চাদরটা রুপোলি, চাদরে সোনার ঝালর আর মুক্তোর ঝুমকো। পালকের গদি তার ওপর পাহাড়প্রমাণ—নরম, মরাল-পালকের গদি।

এই নতুন আশ্চর্য কাণ্ড দেখে সদাগর অবাক। উঁচু পালঙ্কে শুতে যান, রুপোলি চাদরটা টানতে গিয়ে দেখেন তা পাতলা আর নরম — যেন রেশমের। মহলে অন্ধকার নেমে এলো — ঠিক যেন সাঁঝের বেলা, আর বাদ্যি যেন বাজছে অনেক দূরে। তিনি ভাবলেন: 'আঃ মেয়েদের অন্তত স্বপ্নেও যদি দেখা পেতাম!' — তক্ষুনি তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন।

সদাগরের যখন ঘুম ভাঙল ততক্ষণে সূর্য গাছের মাথার ওপরে উঠে গেছে। ঘুম ভাঙলে কী হবে, ঘোর তাঁর চট করে কাটে না। সারা রাত তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর লক্ষ্মী সোনা, মিষ্টি মেয়েদের: বড় আর মেজো যেন খুশিতে ডগমগ, কেবল আদরের ছোট মেয়েটির মুখ ভার: বড় আর মেজো মেয়ের যেন ধনী বর জুটেছে, তারা বাপের আশীর্বাদের অপেক্ষা না করেই বিয়ের তোড়জোড় করছে; আদরের ধন, রূপের ডালি ছোট মেয়েটি কিন্তু যতক্ষণ তার বাপ না ফিরছেন ততক্ষণ বিয়ের কথা কানে তুলছে না। বাপের মনে যেমন আনন্দ হল তেমনি দুঃখও হল।

উঁচু পালঙ্ক ছেড়ে ওঠামাত্রই দেখেন তাঁর জন্যে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী, স্ফটিকের বাটিতে ঝরে পড়ছে ফোয়ারার জল। তিনি জামাকাপড় পরে নিলেন, মুখ-হাত ধুলেন, এখন আর নতুন কোন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তাঁর অবাক লাগছে না: টেবিলে চা আরে কফি, সেই সঙ্গে জলখাবার—মিঠাই। ভগবানের নাম করে তিনি প্রাণ ভরে খেলেন, উঠে আবার এ কুঠরী ও কুঠরী ঘোরেন, সূর্যের রাঙা আলোয় আবার সেগুলোকে দেখে চোখ জুড়াতে চান। এখন সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—গতকালের চেয়েও যেন ভালো। ঐ ত খোলা জানলা দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন রাজপুরীর চারপাশে কী আশ্চর্য সমস্ত ফলফলারির বাগান, আর ফুল যা ফুটেছে তাদের বাহার বর্ণনা করা যায় না। সদাগরের বড় সাধ হল বাগানে গিয়ে একটু বেড়ান।

তিনি নামতে থাকেন অন্য সিঁড়ি বয়ে। ধাপগুলো সবুজ মর্মরপাথরের আর তামাটে মালাকাইটের, হাতল সোনালি। নেমে সোজা চলে এলেন সবুজ গাছগাছড়ায় ছাওয়া বাগানে। তিনি ঘুরে বেড়ান আর তারিফ করেন: গাছে গাছে ঝুলছে পাকা টসটসে টুকটুকে ফলপাকড়—যেন নিজেরাই মুখে পড়ার জন্যে উসখুস করছে, তাদের দিকে তাকালে জিভে জল আসে; কত

রকমের যে সুন্দর সুন্দর ফুল! কোনো কোনো ফুলের অসংখ্য পাপড়ি, কোনো কোনোটার মিষ্টি গন্ধ, আর কতই না তাদের রঙের বাহার! আর উড়ছে সব নাম-না-জানা পাখি-পাখালি — যেন সবুজ আর টুকটুকে রাঙা মখমলের ওপর সোনালি আর রুপোলি ধারা — গান গাইছে যেন স্বর্গপুরীর। ফোয়ারা থেকে এত উঁচুতে জল উঠছে যে সেদিকে তাকাতে গেলে মাথা পেছনে হেলাতে হয়, কুলকুল শব্দে স্ফটিকের নালায় নালায় ছুটে চলেছে ঝরনার ধারা।

ভালোমানুষ সদাগর ঘোরেন আর অবাক হয়ে যান। এই সব আশ্চর্য জিনিস দেখে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন, তিনি বুঝতে পারেন না কোন্‌টা রেখে কোন্‌টার দিকে তাকিয়ে দেখবেন, কাকে রেখে কাকে শুনবেন। এই ভাবে কতক্ষণ কতটা পথ তিনি হাঁটলেন কে জানে — বলতে গেলে ত অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন একটা ছোট্ট সবুজ টিলার ওপর ফুটে আছে আলতা জবা। এমন রূপ কেউ কখনও দেখে নি, তার কথা কেউ কখনও শোনেও নি। সে রূপের বর্ণনা কথায় বলে বোঝানো যায় না, কলমে লেখা যায় না। ভালোমানুষ সদাগরের নিশ্বাস আর পড়ে না; তিনি সেই ফুলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফুলের গন্ধ বাগিচাময় যেন ধারার মতো ছুটে চলেছে। সদাগরের হাত-পা কেঁপে উঠল। তিনি আনন্দে বলে ফেললেন:

'এই ত আলতা জবা! এর চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল এই দুনিয়ায় নেই, এটাই আমার আদরের ধন ছোট মেয়ে চেয়েছিল।'

এই কথা বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে আলতা জবা ছিঁড়ে নিলেন। তক্ষুনি বিনামেঘে বিজলি ঝিলিক দিয়ে উঠল, কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল, পায়ের নীচে মাটিও কেঁপে উঠল, আর সদাগরের সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল এক মূর্তি — না জন্তু, না মানুষ — কিম্ভূত, বিকট, লোমশ দানব। সে ভয়ঙ্কর গর্জন করে বলল:

'তোর এত বড় আস্পর্ধা যে আমার বাগানের, আমার আরামবাগের সাধের ফুল ছিঁড়লি? আমি ওটাকে চোখের মণির মতো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম, রোজ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শান্তি পেতাম, আর তুই কিনা আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করলি! আমি তোকে আদরের অতিথি বলে যত্ন করলাম, পান করতে দিলাম, ভোজ খেতে দিলাম, শুতে দিলাম, আর তুই কিনা আমার ভালো কাজের এই প্রতিদান দিলি? তাহলে জেনে রাখ, তোর কপাল মন্দ: তোর এই পাপের জন্যে তোকে অকালে মরতে হবে!..'

সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে অসংখ্য বন্য জন্তু হাউমাউ করে হাঁকডাক করে উঠল:

'তোর এই পাপের জন্যে তোকে অকালে মরতে হবে!'

ভালোমানুষ সদাগরের ত ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যায়। তিনি চারপাশে তাকালেন; তাকিয়ে দেখতে পেলেন চতুর্দিক থেকে, প্রতিটি গাছ আর ঝোপঝাড়ের তলা থেকে, জল আর মাটির নীচ থেকে তাঁর দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে অসংখ্য বিকট-বীভৎস যত ভূত-প্রেত-দত্যি-দানা। সদাগর সেই বড়কর্তা লোমশ দানবটার সামনে নতজানু হলেন, করুণ স্বরে বললেন:

'দোহাই তোমার, রাজামশাই, বুনো জানোয়ার, জলদত্যি, কী ভাবে যে তোমার গুণগান করব জানি না, সে জ্ঞান আমার নেই! খ্রীষ্টের দোহাই, না বুঝে শুনে আমি যে কুকাজ করে ফেলেছি তার জন্যে আমাকে প্রাণে মেরো না, আমাকে কাটার, আমার গর্দান নেবার হুকুম করো না, আজ্ঞা হয় ত আমি আমার কথা বলি। আমার আছে তিন কন্যা, তিনটিই সুন্দরী, মিষ্টি আর চোখজুড়ানো। আমি ওদের একেকটা উপহার এনে দেব কথা দিয়েছিলাম: বড় মেয়েকে — মণি-মাণিক্যের মুকুট, মেজো মেয়েকে — স্ফটিকের আরশি, আর ছোট মেয়েকে — আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর ফুল দুনিয়ায় আর নেই। বড় আর মেজোর উপহার আমি খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু ছোট মেয়ের উপহার খুঁজে পেলাম না। এমন উপহার — আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর ফুল দুনিয়ায় আর নেই — দেখতে পেলাম তোমার বাগানে। আমি ভাবলাম, ধনীর সেরা ধনী, নামজাদা আর ক্ষমতাবান এমন যিনি প্রভু তিনি আলতা জবার জন্যে হা-হুতাশ করবেন না। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, আমি মুখ্যু মানুষ, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে আমার মেয়েদের কাছে যেতে দাও, আর আমার আদরের ধন ছোট মেয়ের জন্যে আলতা জবাটা আমাকে উপহার দাও। তুমি যত সোনাদানা চাও দেব।'

বন জুড়ে অট্টহাসি উঠল, যেন কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল, বুনো জানোয়ার, জলদত্যি বলল:

'তোর সোনাদানায় আমার কাজ নেই: আমার নিজের সোনাদানাই রাখার ঠাঁই নেই। আমার কাছে ক্ষমা তুই পাবি নে, আমার বিশ্বাসী অনুচরের দল তোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। তোর বাঁচার মাত্র একটি উপায়ই আছে। তোর কোন ক্ষতি না করে তোকে বাড়ি যেতে দেব, প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার দেব, আলতা জবা উপহার দেব, যদি আমাকে খাঁটি সদাগরের মতো দিব্যি করে বলিস আর নিজের হাতে লিখে দিস যে তোর বদলে তোর চোখজুড়ানো মিষ্টি মেয়েদের একজনকে পাঠিয়ে দিবি। আমি তাকে কোন দুঃখু দেব না, সে আমার কাছে মান নিয়ে দিব্যি থাকবে, যেমন তুই আমার পুরীতে ছিলি। একা একা থাকতে আমার খারাপ লাগে, আমি একজন বন্ধু পেতে চাই।'

একথা শুনেই ত সদাগর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তপ্ত চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলেন, চোখ তুলে দেখলেন বুনো জানোয়ারটাকে, জলদত্যিটাকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখজুড়ানো মিষ্টি মেয়েদের কথা মনে পড়ে যেতেই আরো জোরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন — বুনো জানোয়ারটা,

জলদাত্যিটা বড়ই ভয়ঙ্কর। ভালোমানুষ সদাগর অনেকক্ষণ বিলাপ করেন, কেঁদে ভাসান, শেষকালে করুণ স্বরে বললেন:

'দোহাই তোমার রাজামশাই, বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি! আমার চোখজুড়ানো মিষ্টি মেয়েরা যদি নিজের ইচ্ছেয় তোমার কাছে আসতে না চায় তখন কী করব? তা ছাড়া তোমার এখানে কোন্ পথেই বা আসা যায়? তোমার কাছে আমার আসতে লেগেছে পুরো দুটি বচ্ছর, কিন্তু কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে, কোন্ কোন্ পথে এসেছি তা আমি জানি না।'

বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি বলল:

'জোর করে ধরে রাখতে আমি চাই নে। তোর মেয়ে যদি তোকে ভালোবাসে তা হলে তার টানে, আপনিই, নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসবে। আর মেয়েরা কেউ-ই যদি নিজের ইচ্ছেয় না আসে তা হলে তুই নিজে আসবি। তখন আমি তোকে কঠিন সাজা দেব—প্রাণে মারব। আর কী ভাবে আসতে হবে — সে ভাবনা তোর নয়। আমার আঙুল থেকে আংটি খুলে তোকে দিচ্ছি: যে এটা ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরবে সে চোখের পলকে তার ইচ্ছে মতো জায়গায় যেতে পারবে। তোকে বাড়িতে থাকার সময় দিচ্ছি তিন দিন তিন রাত।'

সদাগর ভাবলেন আর ভাবলেন, অনেকক্ষণ ভেবে শেষকালে ঠিক করলেন: 'মেয়েদের সঙ্গে দেখা করাই ভালো। বাপের কর্তব্যটা সেরে আসি, ওদের আশীর্বাদ করে আসি। ওরা যদি আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচাতে না চায় তা হলে ধার্মিকের মতো মরার জন্যে তৈরি হব, বুনো জানোয়ারটার কাছে, জলদাত্যিটার কাছে ফিরে আসব।' তাঁর মাথায় কোন দুষ্টবুদ্ধি ছিল না। তাইতেই ত তাঁর মনের চিন্তা তিনি মুখে বলে দিলেন। বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি অমনিতেই তা জানত। সদাগর যে সত্যবাদী তা সে বুঝতে পারল। তাই তাঁর কাছ থেকে কোনো খতও সে লিখিয়ে নিল না। হাত থেকে সোনার আংটি খুলে সে ভালোমানুষ সদাগরকে দিল।

ভালোমানুষ সদাগর তার ডান হাতের কড়ে আঙুলে আংটিটা পরতে না পরতেই এসে হাজির নিজের বাড়ির বিশাল আঙ্গিনার তোরণের মধ্যে; সেই সময় ঐ তোরণের ভেতর দিয়েই আসতে দেখা গেল তার ধনদৌলত বোঝাই উটের সারি আর বিশ্বাসী অনুচরদের। তারা আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। মেয়েরা রেশমি রুমালের ওপর রুপোলি-সোনালি সুতোর কাজ তুলছিল। বাপকে দেখতে পেয়ে তারাও তাদের কাজ ফেলে ছুটে এলো। মেয়েরা বাপকে চুমো খায়, আদর করে, সোহাগভরে ডাকে, ছোটর চেয়ে বেশি গদগদ ভাব দেখায় বড় দুই বোন। তারা দেখল, বাপ কেমন যেন অখুশি, তাঁর

মনের কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথা আছে। বড় দুই মেয়ে জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তাঁর বিরাট ধনদৌলত খোয়া গেছে কিনা। ছোট মেয়ে কিন্তু ধনদৌলতের কথা ভাবে না, সে তার বাপকে বলল:

'তোমার ধনদৌলতে আমার কাজ নেই; ধনদৌলত রোজগার করা যায়। তোমার মনের ভেতরে কী দুঃখ চাপা আছে আমাকে বল।'

ভালোমানুষ সদাগর তখন তাঁর লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মিষ্টি মেয়েদের বললেন:

'বিরাট ধনদৌলত আমার খোয়া যায় নি, বরং ধনদৌলত দুগুণ-চারগুণ লাভ করেছি; আমার দুঃখ অন্য। কাল তোমাদের সে কথা বলব, আর আজ আমোদ-ফুর্তি করা যাক।'

তিনি লোহার পাতে মোড়া সফরি সিন্দুক-পেটরা আনার হুকুম দিলেন। বার করেন বড় মেয়ের জন্যে সোনার মুকুট, মণিরত্নখচিত আরবদেশের সোনা — আগুনে পোড়ে না, জলে মরচে ধরে না। বার করেন মেজো মেয়ের উপহার — পুবদেশী স্ফটিকের আরশি, বার করেন ছোট মেয়ের উপহার — সোনার ঘটে বসানো আলতা জবা। বড় দুই মেয়ে আহ্লাদে আটখানা। তারা নিজেদের উপহার নিয়ে চলে গেল উঁচু গড়ের ভেতরে, যার যার ঘরে, সেখানে খোলামেলা জায়গায় প্রাণ ভরে তারা তাদের জিনিস নিয়ে আমোদ করল। কেবল আদরের ধন ছোট মেয়ে আলতা জবা দেখামাত্রই থরথর করে কেঁপে উঠল, কেঁদে ফেলল। বুকের ভেতরে সে যেন কিসের একটা খোঁচা খেল।

বাপ তখন মেয়েকে বললেন:

'আমার লক্ষ্মী সোনা আদরের মেয়ে, যে ফুল চেয়েছিলে সেটা কি এখন আর চাও না? এর চেয়ে সুন্দর ফুল কিন্তু দুনিয়ায় নেই!'

মেয়ে ফুলটা নিল যেন অনিচ্ছাভরে। বাপের হাতে চুমো খায়, হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসায়। দেখতে দেখতে ছুটে এলো বড় দুই মেয়ে, বাপের দেয়া উপহার তারা পরখ করে দেখেছে, ওদের এত আনন্দ হয়েছে যে কিছুতেই মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। তখন তারা সবাই নক্সাতোলা চাদর বিছানো ওককাঠের টেবিলের ধারে বসল; টেবিলের ওপর কত যে মিষ্টি খাবার আর মধুর সরবত! খাবার খেয়ে, পানীয় পান করে ওরা শরীর জুড়োতে লাগল, মিষ্টি কথায় এ ওর মন জুড়োতে লাগল।

সাঁঝের বেলায় এখান ওখান থেকে অতিথিরা এসে জুটল, সদাগরের বাড়ি বড় বড় অতিথি আর আত্মীয়স্বজনে গমগম করতে লাগল। মাঝরাত অবধি কথাবার্তা। আর সন্ধের ভোজটা এমনই হয়েছিল যে ভালোমানুষ সদাগর তেমন তাঁর বাড়িতে কোন কালে দেখেন নি।

কোথা থেকে যে কী আসছিল তিনি আন্দাজ করতে পারছিলেন না; অন্যেরাও দেখে অবাক — সোনা-রুপোর বাসন, আজব খাবারদাবার — এমন কেউ কখনও বাড়িতে দেখে নি।

ভোরবেলায় সদাগর বড় মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, যা যা ঘটেছিল বড় মেয়েকে বলে জিজ্ঞেস করলেন নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে বাপকে বাঁচানোর জন্যে সে বুনো জানোয়ারের কাছে, জলদত্যির কাছে বাস করতে যেতে রাজি কিনা। বড় মেয়ে মোটেই রাজি হল না, বলল:

'যে মেয়ের জন্যে বাপ আলতা জবা এনে দিয়েছেন সেই মেয়েই বাপকে উদ্ধার করুক।'

ভালোমানুষ সদাগর দ্বিতীয় মেয়েকে, মেজো মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, যা যা ঘটেছিল মেজো মেয়েকে বলে জিজ্ঞেস করলেন নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে বাপকে বাঁচাতে সে রাজি কিনা। মেজো মেয়ে মোটেই রাজি হল না, বলল:

'যে মেয়ের জন্যে বাপ আলতা জবা এনে দিয়েছেন সেই মেয়েই বাপকে উদ্ধার করুক।'

ভালোমানুষ সদাগর ছোট মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, তাকে সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন, বৃত্তান্ত শেষ হতে না হতেই আদরের ধন ছোট মেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! আশীর্বাদ কর। বুনো জানোয়ারের কাছে, জলদত্যির কাছে আমি যাব, আমি তার কাছে বাস করব। আমার জন্যে তুমি আলতা জবা এনে দিয়েছ, আমার উচিত তোমাকে বাঁচানো।'

ভালোমানুষ সদাগর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলেন, আদরের ধন ছোট মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাকে বললেন:

'আমার লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো আদরের ধন ছোট মেয়ে, তুমি যে নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে বাপকে উদ্ধার করছ, নিজে থেকে, নিজের ইচ্ছায় কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর বুনো জানোয়ারের কাছে বাস করতে চলছ তার জন্যে আমার আশীর্বাদ, বাপের আশীর্বাদ ত তুমি পাবেই। তুমি তার পুরীতে প্রচুর ধনদৌলতের মধ্যে যেমন খুশি তেমন থাকতে পারবে; কিন্তু কোথায় সেই পুরী—কেউ জানে না, কেউ দেখে নি, সেখানে যাবার পথ নেই। সেখানে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায় না, পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, যে সব জন্তুজানোয়ার তুরন্ত চলে তারা সেখানে যেতে পারে না, যে সব পাখি অনবরত বাসাবদল করে বেড়ায় তারাও নয়। তোমার খোঁজখবর আমরা পাব না, আমাদের কোন খোঁজখবরও তুমি পাবে না। আমি এই দুঃখের জীবন কাটাব কী

করে? তোমার মুখ দেখতে পাব না, তোমার মুখের মিঠে বুলি শুনতে পাব না। চিরকালের জন্যে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে যেন জ্যান্ত কবর দিচ্ছি।'

আদরের ধন ছোট মেয়ে বাপকে বলে:

'বাপ গো আমার, কেঁদো না গো, দুঃখ করো না। আমি থাকব বড়লোকের মতো, আমার জীবন হবে স্বাধীন। বুনো জানোয়ারকে, জলদাত্যিকে আমি ডরাই না, সৎপথে থেকে আমি তাকে ভালো ভাবে সেবা করব, সে আমার প্রভু, তার ইচ্ছে আমি পূরণ করব। হয়ত আমার ওপর তার দয়াও হতে পারে। আমি ত বেঁচেই আছি। আমি কি মরে গেছি যে আমার জন্যে বিলাপ করছ? ভগবান যদি করেন, আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

ভালোমানুষ সদাগর কাঁদেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন, এমন কথায় সান্ত্বনা পান না।

ওপরের দুই বোন — বড়তে আর মেজোতে ছুটে এলো, সারা বাড়ি জুড়ে কান্নার রোল তুলল: দেখাতে চায় আদরের ছোট বোনটির জন্য তাদের কী দুঃখই না হচ্ছে! এদিকে ছোট মেয়ের মুখে বিষাদের কোনো চিহ্ন নেই, সে কাঁদে না, হায়-হায় করে না, অজানা দূরের পথের জন্য তৈরি হয়। সঙ্গে নেয় সোনার ঘটে আলতা জবা।

তিন দিন তিন রাত কাটল। ভালোমানুষ সদাগরের বিদায় নেবার পালা, বিদায় দিতে হয় আদরের ধন ছোট মেয়েকে। তিনি তাকে চুমো খান, আদর করেন, অঝোরে তপ্ত অশ্রু ফেলেন, মেয়েকে হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। পাতে মোড়া পেটিকা থেকে বুনো জানোয়ারের, জলদাত্যির আংটিটি বার করেন, আদরের ধন ছোট মেয়ের ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়ে দেন — সেই মুহূর্তেই মেয়ের আর তার সঙ্গের জিনিসপত্রের কোন চিহ্ন রইল না।

নিজেকে সে দেখতে পেল বুনো জানোয়ারের পুরীতে, জলদাত্যির পুরীতে, পাথরের উঁচু উঁচু কুঠরীর ভেতরে, স্ফটিকের পায়ার ওপরে খোদাই করা সোনার পালঙ্কে, সোনালি নক্সাকাটা রঙিন রেশমের চাদরে ঢাকা, মরাল-পালকের গদি বিছানো শয্যার ওপর — যেন সে জায়গা ছেড়ে কোথাও যায় নি, সে সারা জীবন ওখানেই ছিল, যেন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখন জেগে উঠেছে। কোথায় যেন বাদ্যি বেজে উঠল মিঠে সুরে — এমন বাদ্যি সে জন্মে কখনও শোনে নি।

পালকের শয্যা থেকে উঠে সে দেখতে পেল তার সমস্ত জিনিসপত্র, এমন কি সোনার ঘটে আলতা জবাও ওখানেই আছে — মালাকাইটের সবুজ টেবিলগুলোর ওপর সুন্দর সাজিয়ে

গুছিয়ে রাখা; আর সেই কুঠুরিটা অনেক দামী দামী আর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রে সাজানো — বসবার মতো, গা এলিয়ে দেবার মতো আসবাব আছে, আছে পরার মতো পোশাক, নিজেকে দেখার জন্যে আরশি। সেখানে ছিল একটা দেয়াল আগাগোড়া আয়নার, আরেকটা দেয়াল সোনার, আরেকটা রুপোর, আরেকটা হাতির আর ম্যামথের দাঁতের — সর্বত্র মহামূল্যবান হীরে-চুনি-পান্নার কাজ। সে তখন মনে মনে ভাবল, 'এটা বোধহয় আমার শয়ন কুঠুরী।'

গোটা পুরীটা দেখার সাধ তার হল। দানবের সমস্ত উঁচু উঁচু কুঠরী দেখতে দেখতে চলল সে। অনেকক্ষণ চলল, আজব আজব সমস্ত ব্যাপার দেখে তাক লেগে যায়। একটা কুঠরী আরেকটার চেয়ে সুন্দর — তার বাপ, ভালোমানুষ সদাগর যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন তার চাইতেও সুন্দর। সোনার ঘট থেকে বড় সাধের আলতা জবা বার করে নিয়ে বাগানের সবুজ গাছপালার মধ্যে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা তাকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠল স্বর্গপুরীর গান, আর গাছপালা, ঝোপঝাড়, ফুলের দল তাদের মাথা নাড়তে লাগল, যেন তার সামনে মাথা নোয়াল। জলের ফোয়ারা আরও ওপরে উঠল, আরও কলকল শব্দ করে উঠল ঝরনার ধারা। সে খুঁজে বার করল ঘাসে ঢাকা সেই উঁচু জমিটা যেখান থেকে ভালোমানুষ সদাগর ছিঁড়েছিলেন আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর ফুল দুনিয়ায় আর নেই। সেই আলতা জবাকে সোনার ঘট থেকে বার করে সে আগের জায়গায় বসাতে যাবে, অমনি সে নিজেই টুক করে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে আগেকার জায়গায় গিয়ে লেগে গেল, আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে ফুটে রইল।

এই অদ্ভুতের ওপর অদ্ভুত কান্ড, আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সে অবাক, সাধের আলতা জবার দিকে তাকিয়ে তার আনন্দ ধরে না। এবারে সে ফিরে চলল তার পুরীর কুঠরীগুলোর দিকে। সেগুলোর একটাতে টেবিল সাজানো রয়েছে। সে সবে মনে মনে ভেবেছে: 'দেখা যাচ্ছে আমার ওপর বুনো জানোয়ারের, জলদত্যির কোন রাগ নেই, সে আমার সঙ্গে দরদী প্রভুর মতো ব্যবহার করবে,' অমনি সাদা মর্মরপাথরের দেয়ালে অগ্নি-আখরে ফুটে উঠল:

'আমি প্রভু নই, আমি তোমার দাসানুদাস। তুমি আমার কর্ত্রী, তুমি যা চাও, যা তোমার মন চায়, তা-ই তামিল করে খুশি হব।'

অগ্নি-আখরে লেখা কথাগুলো তার পড়া হয়ে যাওয়া মাত্রই সাদা মর্মরপাথরের দেয়াল থেকে মুছে গেল -- যেন সেখানে কোন কালেই ছিল না। তার মনে মনে ইচ্ছে হল বাপের কাছে চিঠি লেখে, নিজের সংবাদ জানায়। ভাবতে না ভাবতেই সামনে কাগজ, সোনার কলম আর দোয়াত। সে তার আদরের বাপকে আর স্নেহের বোনদের চিঠি লেখে:

'আমার জন্যে কেঁদো না, দুঃখ করো না, আমি বুনো জানোয়ারের পুরীতে, জলদস্যুর পুরীতে কর্ত্রীর মতো আছি। তাকে দেখতে পাই নি, তার আওয়াজও শুনি নি, কিন্তু সে অগ্নি-আখরে সাদা মর্মরপাথরের দেয়ালের ওপর লিখে আমাকে তার মনের কথা জানায়; আমার মনের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে, আর তক্ষুনি আমার ইচ্ছা পূরণ করে। সে চায় না যে আমি তাকে আমার প্রভু বলি, সে আমাকেই তার কর্ত্রী বলে।'

চিঠি লেখা শেষ করে শিলমোহর করে বন্ধ করতে না করতেই হাত থেকে, দৃষ্টির সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল — যেন সেখানে ছিলই না। বাদ্যি আরও জোরে বেজে উঠল, টেবিলের ওপর এসে হাজির হল মিষ্টি খাবার আর মিঠে সরবত, বাসন সব খাঁটি সোনার। সে খুশি হয়ে টেবিলের ধারে বসে পড়ল, যদিও জীবনে সে একা একা খায় নি। খাবার খেল, পান করল, তার শরীর জুড়িয়ে গেল, বাজনায় তার আনন্দ হচ্ছিল। বেশ করে খেয়ে দেয়ে সে ঘুমোতে গেল। যাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেই জন্য বাদ্যি বাজতে লাগল বেশ আস্তে আস্তে, অনেকটা দূরে।

নিদ্রার পর যখন সে উঠল তখন তার মেজাজ বেজায় খুশি। আবার সে বেড়াতে গেল সবুজ গাছপালায় ঢাকা বাগানে, কেননা এর আগে বাগানের অর্ধেকই তার ঘুরে দেখার অবসর হয় নি, সব আশ্চর্য দেখা হয়ে ওঠে নি। সব গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ফুলের দল তার সামনে মাথা নোয়ায়, আর ফল পাকড় — নাসপাতি, পীচফল, রসাল আপেল — নিজেরাই টুপটাপ মুখে এসে পড়ে। প্রায় সন্ধে অবধি, বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সে তার উঁচু দেয়াল ঘেরা কুঠরীতে ফিরল, দেখতে পেল টেবিল সাজানো, আর টেবিলের ওপর আছে নানা মিষ্টি খাবার, মিঠে সরবত, আরও সব চমৎকার চমৎকার খাবার।

সন্ধ্যার খাবারের পর সে গেল সেই সাদা মর্মরপাথরের কুঠরীতে, যেখানে পড়েছিল অগ্নি-আখরে লেখা কথা। দেখতে পেল সেই একই দেয়ালে আবার সেই অগ্নি-আখরে লেখা শব্দমালা:

'আমার কর্ত্রী কি তার বাগিচায় আর মহলে, খাবারে আর দাসের সেবায় সন্তুষ্ট?'

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি কণ্ঠে খুশি ঝরিয়ে বলল:

'আমাকে তুমি তোমার কর্ত্রী বলো না, তুমি চিরকালের জন্যে আমার স্নেহময়, দয়াময়, দরদী প্রভু হও। আমি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করব না। যে আদর-যত্ন তুমি করেছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার উঁচু প্রাসাদ-কুঠরীর চেয়ে ভালো প্রাসাদ-কুঠরী, তোমার সবুজ বাগিচার চেয়ে ভালো বাগিচা দুনিয়ায় আর নেই। আমি কি খুশি না হয়ে পারি? আমি

জন্মে কখনও এমন আশ্চর্য জিনিস দেখি নি। এমন আশ্চর্য কান্ডকারখানা দেখেশুনে আমি আর আমাতে নেই। আমার কেবল ভয় একা রাত কাটাতে। তোমার এত উঁচু উঁচু মহলের কোনটাতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।'

দেয়ালে আবার অগ্নি-আখরে লেখা ফুটে উঠল:

'ভয় পেয়ো না আমার সুন্দরী কর্ত্রী, তোমাকে একা একা রাত কাটাতে হবে না, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে তোমার আদরের, প্রিয় সখী, আর কুঠরীতে মানুষও অনেক, কেবল তুমি তাদের চোখে দেখতে পাও না, তাদের কথা শুনতে পাও না, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সবাই মিলে রাত দিন তোমার দেখাশোনা করছে। তোমার গায়ে যাতে বাতাসের ফুঁ না লাগে, যাতে ধূলিকণা না বসে আমরা সেদিকে খেয়াল রাখি।'

শয়নের জন্যে সদাগরের ছোট মেয়ে শয়ন কুঠরীতে যেতেই দেখে পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার আদরের, প্রিয় সখী — ভয়ে যেন কাঠ হয়ে আছে। কর্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তার ধড়ে প্রাণ এলো, তার ধবধবে হাতে চুমো খেল, তার চঞ্চল পাদুটো জড়িয়ে ধরল। কর্ত্রীও খুশি, জিজ্ঞেস করে প্রিয় বাপের কথা, বড় বোনদের কথা আর নিজের দাসীর কথা; তারপর ইতিমধ্যে তার নিজের জীবনে যা যা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে সে সব বলতে বসল। ভোর অবধি তারা আর নিদ্রাই গেল না।

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি এই ভাবে আছে ত আছেই। তার জন্যে নিত্য নতুন পোশাক — জমকাল, আর সাজসজ্জা এমনই, এতই অমূল্য যে কথায় বলে বোঝানো যায় না, কলমে লেখা যায় না। নিত্য নতুন চমৎকার চমৎকার খাবারদাবার আর আমোদপ্রমোদ: বাজনার সঙ্গে সঙ্গে রথে চেপে অন্ধকার বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। সে রথের লাগাম নেই, ঘোড়া নেই। তার সামনে সে বন ফাঁকা হয়ে গিয়ে ধুধু চওড়া আর সমান পথ করে দেয়। সে সেলাই ফোঁড়াইয়ের মেয়েলি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে — কাপড়ে সোনা-রুপোর সুতোয় নক্সা তোলে, ঘন মুক্তোর সারি দিয়ে ঝালর বোনে, প্রিয় বাপকে উপহার পাঠায়, আর সবচেয়ে জমকাল চাদরটা সে উপহার দেয় তার দয়াময় প্রভুকে। রোজ সে ঘন ঘন আসে সাদা মর্মরপাথরের কুঠরীতে, তার দয়াময় প্রভুর সঙ্গে স্নেহমাখা কথা বলে, অগ্নি-আখরে লেখা তার জবাব আর অভিনন্দন পড়ে।

এমনি করে কত কাল যে কাটল কে জানে — বলতে গেলে ত অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি তার এ জীবন মানিয়ে নিতে লাগল। এখন আর সে কিছুতে অবাক হয় না, কিছুতেই ভয় পায় না। অদৃশ্য সেবকেরা তার সেবা করে, তাকে খাবার পরিবেশন করে, আপ্যায়ন করে, বিনি ঘোড়ার রথে চাপিয়ে ঘোরায়, বাজনা বাজিয়ে শোনায়, তার সমস্ত হুকুম তামিল করে। দিনে দিনে দয়াময় প্রভুটিকে আরও

ভালোবেসে ফেলে, দেখল যে সে অমনি অমনিই তাকে নিজের কর্ত্রী বলে ডাকে না, তাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সদাগর-কন্যার ইচ্ছে হল তার গলার আওয়াজ শোনে, মর্মরপাথরের শ্বেতকুঠরীতে না গিয়েই, অগ্নি-আখরের লেখা ছাড়াই তার সঙ্গে কথাবার্তা চালায়।

এই নিয়ে সে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। কিন্তু বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি সহজে তার অনুরোধে রাজি হল না, তার ভয় হল সদাগর-কন্যা তার গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে যাবে। সে তার দয়াময় প্রভুকে শেষ অবধি বলে কয়ে রাজি করাল। বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি তার কথা ঠেলতে পারল না, শেষ বারের মতো সে সদাগর-কন্যার জন্যে সাদা মর্মরপাথরের দেয়ালের ওপর অগ্নি-আখরে লিখল:

'আজ সবুজ বাগিচায় এসো, লতাপাতা ডালপালা আর ফুলে ফুলে জড়ানো তোমার সাধের কুঞ্জে এসে বসো, তারপর তুমি বলবে: 'আমার অনুগত দাস, আমার সঙ্গে কথা বল।''

অল্প কিছু সময় পরেই সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি সবুজ বাগিচায়, লতাপাতা ডালপালা আর ফুলে ফুলে জড়ানো সাধের কুঞ্জের ভেতরে এসে বেঞ্চিতে বসল। তার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল ফাঁদে-পড়া পাখির মতো। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল:

'প্রভু, আমার স্নেহময়, দয়াময় প্রভু, ভয় পেয়ো না — তোমার গলার আওয়াজে আমি ভয় পাব না; আমাকে তুমি যে এত দয়া দেখিয়েছ তার পর জন্তুর গর্জনেও আমি ভয় পাব না; ভয় নেই, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল।'

সদাগর-কন্যা শুনতে পেল কুঞ্জের পেছনে কে যেন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল, তারপরই বেজে উঠল ভয়ঙ্কর গলার আওয়াজ — বুনো আর কান ফাটানো, খনখনে আর হিসহিসে, তা-ও আবার সে বলছিল চাপা গলায়। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি বুনো জানোয়ারের, জলদাত্যির গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল, কেবল ভয় সে মনে মনে চেপে রাখল, চেহারায় ভয়ের ভাব ফুটতে দিল না। বুনো জানোয়ারের, জলদাত্যির মিষ্ট আর শিষ্ট, সারগর্ভ আর জ্ঞানগর্ভ কথা সে শুনতে লাগল, শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল, তার মন খুশিতে ভরে উঠল।

এর পর থেকে, সেই দিন থেকে তাদের কথাবার্তা চলত সারা দিনমান — সবুজ বাগিচায় বেড়াতে বেড়াতে, অন্ধকার বনে বনে রথে চেপে ঘুরতে ঘুরতে, উঁচু উঁচু মহলগুলোর ভেতরে ভেতরে। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি একবার বললেই হল:

'আমার প্রিয়, দরদী প্রভু, তুমি কি এখানে?'

বুনো জানোয়ার, জলদত্যি জবাবে বলে:

'আমার সুন্দরী কর্ত্রী, তোমার অনুগত দাস, তোমার চিরসখা আমি এইখানে।'

তার বুনো ও ভয়ঙ্কর গলার আওয়াজে সে ভয় পায় না, তাদের মধুর কথাবার্তা আর ফুরোয় না।

এই ভাবে কত কাল যে কেটে গেল কে জানে — বলতে গেলে ত অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। সদাগরের ছোট মেয়ের, রূপের ডালি মেয়েটির ইচ্ছে হল বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে নিজের চোখে দেখে। এই নিয়ে সে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। বুনো জানোয়ার, জলদত্যি সহজে তার অনুরোধে রাজি হয় না, তার আশঙ্কা হয় সদাগর-কন্যা ভয় পেয়ে যাবে, কেননা সে ছিল এমনই ভয়ঙ্কর যে কথায় বলে বোঝানো যায় না, কলমে লেখা যায় না। কেবল মানুষ কেন, বনের জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত তাকে দেখে চিরকাল ভয় পেত, ছুটে পালিয়ে যেত যে যার গর্তে। বুনো জানোয়ার, জলদত্যি বলল:

'আমার পরমা সুন্দরী কর্ত্রী, আমার প্রিয় সুন্দরীটি, আমায় অনুরোধ-উপরোধ করো না — আমার কুৎসিত মুখ, বিকট চেহারা আমি তোমাকে দেখাতে পারব না। আমার গলার আওয়াজ তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে; আমরা বন্ধুর মতো মিলেমিশে আছি, আমরা একে অন্যকে ছেড়ে প্রায় থাকিই না, তোমাকে আমি যে কত ভালোবাসি তা কী বলব, আর তার জন্যে তুমিও আমাকে ভালোবাস। কিন্তু আমার কুৎসিত, ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তুমি এই হতভাগা আমাকে ঘৃণা করবে, চোখের সামনে থেকে দূর করে দেবে, আর তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে আমি শোকে-দুঃখে মারাই যাব।'

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি সে কথা শুনল না, আরও জোরজার করতে লাগল, দিব্যি করে বলল যে দুনিয়ায় কোন ভয়ঙ্কর জীবকে সে ভয় করে না, সে তার দরদী প্রভুকে আগের মতোই ভালোবাসবে। বলল:

'তুমি যদি থুত্থুড়ে বুড়ো মানুষ হয়ে থাক, তাহলে আমার দাদু হবে, যদি মাঝবয়সী হও আমার খুড়ো হবে, যদি অল্পবয়সী হও আমার পাতানো ভাই হবে, যত দিন আমি বেঁচে থাকব তুমি আমার প্রাণসখা হয়ে থাকবে।'

বুনো জানোয়ার, জলদত্যি কিছুতেই সে কথায় রাজি হয় না, কিন্তু সে তার সুন্দরী

কর্ত্রীটির অনুরোধ ঠেলতে পারে না, তার চোখের জলের কাছে হার মেনে শেষকালে বললে:

'আমি নিজের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসি, তাই তোমার কথা ফেলতে পারছি না; তোমার ইচ্ছে পূরণ করব, যদিও জানি যে আমার কপাল তাতে ভাঙবে, আমি অকালে মারা যাব। সন্ধ্যার ধূসর আঁধার যখন ঘনিয়ে আসবে, যখন বনের ওপারে লাল রঙের সূর্য অস্ত যাবে, তখন সবুজ বাগিচায় এসে বলো: 'আমার প্রাণের বন্ধু, দেখা দাও!' আমি তোমাকে দেখাব আমার কুৎসিত মুখ, বিকট রূপ। আমার কাছে থাকতে যখনই তোমার অসহ্য লাগবে তখনই জানাবে, তোমাকে চিরকাল তোমার অনিচ্ছায় ধরে রেখে যন্ত্রণা দিতে আমি চাই না: তোমার শয়ন কুঠরীতে বালিশের তলায় তুমি পাবে আমার সোনার আংটি। ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরলেই তুমি তোমার প্রিয় বাপের কাছে গিয়ে হাজির হবে, আমার কোন কথা কোন কালে শুনতে পাবে না।'

কোন রকম ভয়-ডর না করে সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখল। এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত না করে সে তৎক্ষণাৎ চলল সবুজ বাগিচার দিকে, অপেক্ষা করতে লাগল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে, বনের ওপারে লাল রঙের সূর্য অস্ত যেতে সে উচ্চারণ করল: 'আমার প্রাণের বন্ধু, দেখা দাও!' সঙ্গে সঙ্গে দূরে থেকে সে দেখতে পেল বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে: সে কেবল আড়াআড়ি পথ পার হয়ে ঘন ঝোপের ভেতরে গিয়ে গা ঢাকা দিল, অমনি সদাগরের ছোট মেয়ে রূপের ডালিটি চোখে আঁধার দেখল, আঁতকে উঠে রিনরিনে গলায় চিৎকার দিয়ে পথের ওপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সত্যিই কী ভয়ঙ্করই না ছিল সেই বুনো জানোয়ারটি, জলদত্যিটি! — হাতগুলো তার বাঁকা, হাতে তার পশুর নখ, পাগুলো ঘোড়ার, সামনে আর পেছনে বিরাট বিরাট দুটো কুঁজ — উটের যেমন থাকে; পা থেকে মাথা পর্যন্ত আলুথালু, লোমশ, মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে বুনো শুয়োরের মতো কশের দুটি দাঁত, নাক বাজপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো, চোখজোড়া পেঁচার।

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি এই ভাবে কতক্ষণ পড়ে ছিল কে জানে। জ্ঞান ফিরে আসতে সে শুনতে পেল তার কাছাকাছি কোথাও কে যেন কাঁদছে, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে করুণ স্বরে বলছে:

'তুমি আমাকে মেরে ফেললে গো সুন্দরী, তুমি আর আমায় ভালোবাস না, তোমার অমন সুন্দর মুখটি আমি আর দেখতে পাব না, আমাকে অকালে মারা যেতে হচ্ছে।'

সদাগরের মেয়ের মনে মনে দুঃখ হল, লজ্জা হল। ভয়ানক আতঙ্ক আর লাজুক মেয়ের ভীরুতা সামলে নিয়ে সে কোন রকম ইতস্তত না করে বলল:

'না, আমার স্নেহময়, দয়াময় প্রভু, ভয় পেয়ো না, তোমার ভয়ংকর চেহারা দেখে আমি আর ভয় পাব না, তোমাকে আমি ছেড়ে যাব না, তোমার দয়া আমি ভুলব না; এখন তুমি তোমার ঐ রূপেই দেখা দাও; আমি কেবল প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তার সেই ভয়ংকর, কুৎসিত, কদর্য রূপে দেখা দিল, কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও সদাগর-কন্যার কাছাকাছি এগিয়ে আসার সাহস তার হল না। তারা ঘুরে বেড়াল যতক্ষণ না রাতের আঁধার নেমে এলো, কথাবার্তা বলল আগের মতো, দরদভরা, জ্ঞানগর্ভ। সদাগরের ছোট মেয়েটি, রূপের ডালি মেয়েটি কোন ভয় পেল না। পর দিন সে রক্তিম সূর্যের আলোয় বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে দেখতে পেল। তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সময় ভয় পেয়ে গেলেও সে তা প্রকাশ করল না। ক্রমে তার ভয় একেবারে কেটে গেল। এবারে তাদের আরও ঘন ঘন কথাবার্তা চলল। সারাটা দিন তাদের আর ছাড়াছাড়ি হয় না, দুপুরে ও সন্ধ্যায় তারা তৃপ্তিভরে মিষ্টি আহার করে, মধুর পানীয়ে প্রাণ জুড়ায়, সবুজ বাগিচায় ঘোরে, বিনি ঘোড়ার রথে আঁধার বনে বনে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে অনেক কাল কেটে গেল — বলতে গেলে অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। শেষকালে একদিন সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি স্বপ্নে দেখল যে বাপ তার অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তার মনটা এমন আনচান করে উঠল যে সে ভাব আর কিছুতেই কাটে না। বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তাকে মন খারাপ করতে আর চোখের জল ফেলতে দেখে মনে বড় ব্যথা পেয়ে জিজ্ঞেস করল তার মন এমন খারাপ কেন, তার চোখে জল কেন। সদাগর-কন্যা তাকে খারাপ স্বপ্নের কথা বলল, প্রিয় বাপকে আর মিষ্টি বোনদের একবারটি দেখে আসার জন্য তার অনুমতি চাইল। বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তাকে বলল:

'আমার অনুমতিতে তোমার কাজ কি? আমার সোনার আংটি তোমার কাছেই আছে, ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরা মাত্রই বাড়িতে তোমার প্রিয় বাপের কাছে গিয়ে হাজির হবে। যতক্ষণ আমার জন্যে তোমার মন খারাপ না হয় ততক্ষণ থেকে যেতে পার, তবে একটা কথা তোমাকে বলি: ঠিক তিন দিন তিন রাত পরে যদি না ফের তা হলে আমাকে আর এ জগতে দেখতে পাবে না, ঐ মুহূর্তেই আমি মারা যাব, তার কারণ এই

যে আমি তোমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারি না।'

সদাগর-কন্যা তাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়ে আর দিব্যি করে বলল যে তিন দিন তিন রাত পেরোবার ঠিক এক ঘণ্টা আগে সে তার বিশাল পুরীর কুঠরীতে ফিরে আসবে।

সে তার স্নেহময় দয়াময় প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল, ডান হাতের কড়ে আঙুলে আংটি পরতে না পরতে এসে হাজির হল তার প্রিয় বাপ ভালোমানুষ সদাগরের বাড়ির বিশাল আঙ্গিনায়। সদাগরের পাষাণকুঠরীর উঁচু দেউড়িতে গিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো ঘরের দাসী, পুরীর খাস দাসদাসীর দল, হৈ-হট্টগোল তুলল তারা। তা শুনে ছুটে এলো তার মিষ্টি বোনেরা, তার কাঁচা রূপলাবণ্য দেখে, পরনে রাজরানীর মতো সাজসজ্জা দেখে ওরা ত অবাক। বোনের সাদা ধবধবে সুন্দর হাতখানা চেপে ধরে ওরা তাকে নিয়ে গেল প্রিয় বাপের কাছে। এদিকে বাপ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, মনে তাঁর সুখ নেই, দিনরাত মেয়ের কথা ভেবে ভেবে তপ্ত অশ্রু ঝরিয়ে চলেছেন। লক্ষ্মী সোনা, আদরের ধন, চোখজুড়ানো ছোট মেয়েকে দেখতে পেয়ে সদাগর ত আনন্দে আত্মহারা; তার কাঁচা রূপলাবণ্য দেখে, পরনে রাজরানীর মতো সাজসজ্জা দেখে তিনি অবাক।

অনেকক্ষণ তারা এ ওকে চুমো খেল, আদর করল, দরদভরা কথায় একে অন্যকে সান্ত্বনা দিল। প্রিয় বাপ আর মিষ্টি বড় বোনদের কাছে সে বুনো জানোয়ারের পুরীতে, জলদত্যির পুরীতে তার জীবনযাত্রার অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা দিল, ছিটেফোঁটাও বাদ দিল না। সে যে ধনী হয়ে রাজরানীর মতো বাস করছে তাতে ভালোমানুষ সদাগর মহা খুশি হলেন, মেয়ের দৃষ্টি যে কদাকার প্রভুটিকে মানিয়ে নিয়েছে, সে যে বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে ভয় পায় না তাতে সদাগর আশ্চর্য হলেন। ছোট বোনের বিপুল ধনসম্পদের কথা শুনে আর সে যে রাজরানীর মতো ক্ষমতা পেয়ে তার প্রভুর ওপর দাপটে রাজত্ব করছে এ কথা জানতে পেয়ে বড় দুই বোনের কিন্তু হিংসে হল।

এক দিন কাটল — যেন একটি ঘণ্টা, আরও এক দিন কাটল — যেন এক দণ্ড। তিন দিনের দিন বড় দুই বোন ছোট বোনকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে যেন বুনো জানোয়ারটার কাছে, জলদত্যিটার কাছে ফিরে না যায়। 'ওটা মরুক গে, ওর অমনই গতি হওয়া উচিত...' ওরা বলল। প্রিয় অতিথি ছোট বোন বড় বোনদের ওপর রেগে গিয়ে বলল:

'আমার প্রভু ভালো, দরদী, সে আমাকে বড় দয়া করে, আমাকে এত ভালোবাসে যে ভাষায় বলা যায় না, তার এই দয়া আর ভালোবাসার প্রতিদানে আমি যদি তাকে নিষ্ঠুর মরণের দিকে

ঠেলে দিই তা হলে আমার এই জীবনে কাজ নেই, বুনো জন্তুজানোয়ার আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেই ভালো।'

তার বাপ, ভালোমানুষ সদাগরও এমন ভালো কথার জন্যে তাকে প্রশংসা করলেন। ঠিক হল আদরের ছোট মেয়ে, লক্ষ্মী সোনা চোখজুড়ানো মেয়েটি নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক এক ঘণ্টা আগে বুনো জানোয়ারের কাছে, জলদত্যির কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু বড় দুই বোনের আফশোস হল, তারা একটা ফন্দি আঁটল, দুষ্টবুদ্ধি খাটাল: বাড়ির সমস্ত ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে এক ঘণ্টা পেছিয়ে রেখে দিল। ভালোমানুষ সদাগর, তার বাড়ির বিশ্বস্ত দাসী, পুরীর খাস দাসদাসীরা কেউই এ কারসাজি দেখতে পেল না।

আসল সময় যখন এলো তখন সদাগরের ছোট মেয়ের, রূপের ডালি মেয়েটির বুকের ভেতরটা মুচড়ে টনটন করে উঠল, কেমন যেন অস্থির অস্থির করতে লাগল। থেকে থেকে সে বাপের দিশী, বিলিতি যত রাজ্যের ঘড়ির দিকে তাকায় — না, এখনও যাত্রার সময় হয় নি। এদিকে বোনেরা তার সঙ্গে একথা সেকথা বলে, এটা ওটা জিজ্ঞেস করে, তাকে দেরি করিয়ে দেয়। কিন্তু তার মন আর মানে না; আদরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি তার প্রিয় বাপ ভালোমানুষ সদাগর আর বড় দুই মিষ্টি বোনের কাছ থেকে বিদায় নিল, এক দণ্ডের জন্যে বাঁধা মেয়াদের আর অপেক্ষা না করে সোনার আংটি ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরল, অমনি এসে হাজির বুনো জানোয়ারের, জলদত্যির শ্বেতপাথরের প্রাসাদে, উঁচু দেয়াল ঘেরা কুঠরীর ভেতরে। কিন্তু সে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না দেখে সদাগর-কন্যা অবাক হয়ে গেল, চেঁচিয়ে বলল:

'কোথায় তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, দরদী প্রভু? আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ না কেন? আমি বাঁধা মেয়াদের পুরো এক ঘণ্টা আর এক দণ্ড আগে ফিরে এসেছি।'

কোন সাড়াশব্দ নেই। মৃত্যুর নীরবতা। সবুজ বাগিচায় পাখিরা স্বর্গপুরীর গান গাইছে না, জলের ফোয়ারা নেই, ঝরনার জলের কুলুকুলু শোনা যাচ্ছে না, উঁচু অট্টালিকার ভেতরে বাদ্যি বাজছে না। সদাগর-কন্যার, রূপের ডালি মেয়েটির বুক কেঁপে উঠল, মনটা খারাপ হয়ে গেল। উঁচু উঁচু মহল আর সবুজ বাগিচা ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখল, গলা চড়িয়ে ডাকল তার প্রিয়, দরদী প্রভুকে — কোথাও কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, কোন রকম গলার আওয়াজ শোনা যায় না। সে ছুটে গেল দূর্বাঘাসে ঢাকা টিলাটার ওপর, যেখানে শোভা পাচ্ছিল তার সাধের আলতা জবাটি। দেখতে পেল বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তার কদর্য থাবায় আলতা জবা আঁকড়ে ধরে টিলার ওপর পড়ে আছে। সদাগর-কন্যার মনে হল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে, তার অপেক্ষায় থেকে থেকে এখন গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়েছে।

রূপের ডালি সদাগর-কন্যা ধীরে ধীরে ওকে জাগানোর চেষ্টা করল — ও শুনতে পেল না।

এবারে আরও জোরে ওকে নাড়া দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করল, ওর লোমশ থাবা জড়িয়ে ধরল — দেখতে পেল বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি জ্ঞান হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে আছে...

সদাগর-কন্যার উজল আঁখি অন্ধকার হয়ে এলো, চঞ্চল পাদুটি যেন ভেঙে পড়ল, সে নতজানু হয়ে তার সাদা ধবধবে হাত দিয়ে প্রিয় প্রভুর মাথা, কুৎসিত কদাকার প্রাণীটার মাথা জড়িয়ে ধরল, নিস্তেজ স্বরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলল:

'ওঠ, প্রাণের বন্ধু আমার, জাগ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমার প্রাণের স্বামী!..'

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বিজলি ঝিলিক দিয়ে উঠল, ভয়ানক বজ্রপাতে মাটি কেঁপে উঠল, বজ্রের পাষাণতীর এসে আছড়ে পড়ল দূর্বাঘাসে ঢাকা টিলার ওপর। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই ভাবে কতক্ষণ সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল কে জানে। কেবল জ্ঞান ফিরে আসতে সে দেখতে পেল বসে আছে আকাশছোঁয়া সাদা মর্মরপাথরের রাজপুরীর কুঠরীতে, মণি-মাণিক্যের কাজ করা সোনার সিংহাসনে আর তাকে সোহাগের আলিঙ্গন দিচ্ছে এক অপরূপ যুবক — রাজকুমার। সেই যুবক রাজকুমারের মাথায় রাজমুকুট। নিরেট সোনার পোশাক পরনে। তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপ আর বোনেরা, চারপাশে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জমকাল চেহারার পাত্রমিত্র অমাত্যের দল — সকলের পোশাক সোনালি ও রুপোলি জরির। যুবক রাজকুমার ওর সঙ্গে কথা বলছে — অপরূপ দেখতে, মাথায় রাজমুকুট। সে সদাগর-কন্যাকে বলল:

'আমার চোখজুড়ানো সুন্দরী, আমি দেখতে বিকট দানবের মতো হলেও আমার ভালো স্বভাব আর ভালোবাসার জন্যে তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে, এখন আমি মানুষের মূর্তিধারী, আমাকে ভালোবাস, আমার আদরের বধূ হও। আমার স্বর্গত পিতা ছিলেন নামজাদা শক্তিশালী রাজা, দুষ্টবুদ্ধি মায়াবিনীর কোপ তাঁর ওপর এসে পড়ে। আমার বয়স যখন একেবারেই অল্প তখন সে আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়, তার শয়তানী, দুষ্ট মায়াবলে আমাকে ভয়ঙ্কর দানবের রূপ দেয়, এই অভিশাপ দেয় যে আমাকে এই কদাকার রূপ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে, যতক্ষণ না যে-কোন বংশের যে-কোন গোত্রের কোন সুন্দরী মেয়ে এসে আমাকে আমার এই বিকট রূপেই ভালোবাসবে, আমার সত্যিকারের বধূ হতে চাইবে — তখন এই মায়ামন্ত্র কেটে যাবে, আমি আবার আগের মতো মানুষের রূপ পাব — রূপবান যুবক হব। এমন বিকট আর ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আমি ঠিক তিরিশ বছর কাটাই, আমার এই মায়াপুরীতে এগারোটি সুন্দর সুন্দর

মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম, তোমাকে নিয়ে বারোজন। একটি মেয়েও আমার স্নেহ ও দরদের ডাকে, আমার প্রাণের ডাকে সাড়া দিল না। একমাত্র তুমিই আমার অগাধ ভালোবাসায়, আমার স্নেহ ও দরদের ডাকে, আমার প্রাণের ডাকে আমার মতো কুৎসিত, কদাকার দানবকে ভালোবাসলে। তাই তুমি হবে নামজাদা রাজার ঘরণী, বিশাল রাজ্যের রানী।

একথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল, পাত্রমিত্র অমাত্যের দল আভূমি নত হয়ে নমস্কার জানাল। ভালোমানুষ সদাগর তার আদরের ধন, ছোট মেয়েকে আর রাজার কুমারকে আশীর্বাদ জানালেন। হিংসুটে দুই বড় বোন আর সমস্ত বিশ্বাসী অনুচরেরা, বড় বড় রাজপুরুষেরা আর দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার যোদ্ধারা বর-বধূকে অভিনন্দন জানাল। তৎক্ষণাৎ আনন্দের ভোজসভা আর বিয়ের আসর বসে গেল। ওরা সুখে শান্তিতে ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল।

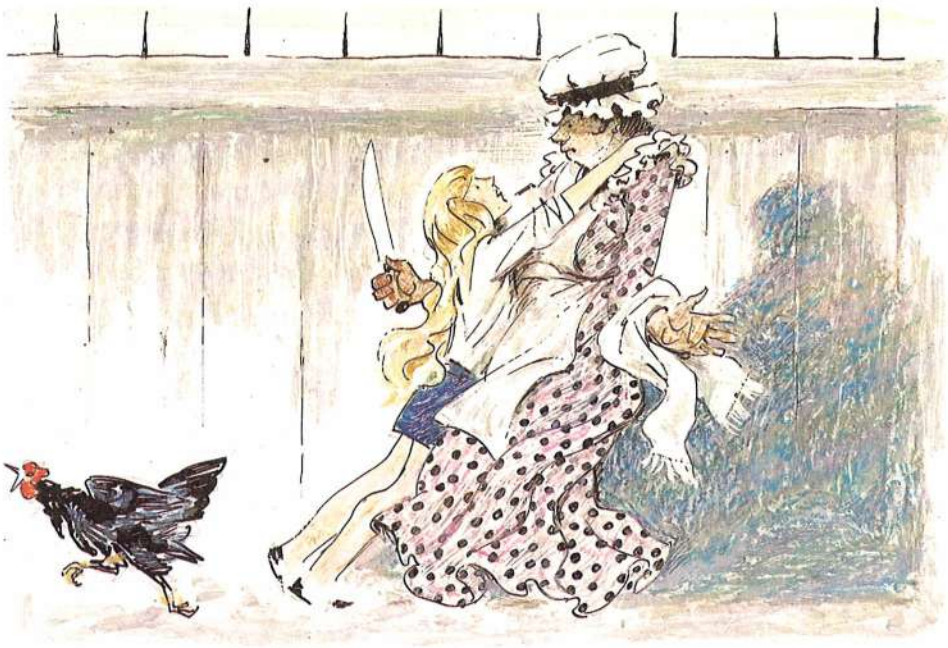

আন্তোনি পগরেল্‌স্কি

কালোমানিক অথবা পাতালবাসী মানুষ

ছোটদের মায়াকাহিনী

আজ থেকে বছর চল্লিশেক আগে* সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপের** ফার্স্ট লাইনে বাস করত ছেলেদের কোন এক বোর্ডিং-স্কুলের এক মালিক। বোর্ডিং-স্কুলটার কথা হয়ত এখনও অনেকের বেশ মনে আছে, যদিও যে বাড়িতে ওটা ছিল তার জায়গায় অনেককাল

---

* এই রূপকথাটি লেখা হয় ১৮২৯ সালে।

** ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপ — সেণ্ট পিটার্সবুর্গের একটি অঞ্চল।

আগেই নতুন একটা বাড়ি উঠেছে, আর সে বাড়িটা দেখতেও একেবারেই আগেরটার মতন নয়। তখনই গোটা ইউরোপ জুড়ে আমাদের সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নামডাক ছিল তার সৌন্দর্যের জন্যে, যদিও এখনকার সঙ্গে তার মোটে তুলনা চলে না। সেই সময় ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের রাজপথগুলোর দুধারে মনমাতানো ছায়াতরুর সারি ছিল না। আজ যেখানে সুন্দর সুন্দর ফুটপাথ আছে, তখন সেখানে ছিল কাঠের পাটাতন — বেশির ভাগই পচা কাঠের তক্তায় তৈরি। সেণ্ট ইসাক সেতু তখন ছিল সরু আর উঁচুনীচু—আজকালকার মতন নয়, একেবারে অন্যরকম দেখতে। এক কথায়, তখনকার সেণ্ট পিটার্সবুর্গ আজ যেমন দেখছ তেমন ছিল না। এখানে বলে রাখি, মানুষের ওপর শহরগুলো টেক্কা মারতে পারে এখানেই যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারা অনেক সময় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সে যাক গে, এখানে ব্যাপারটা তা নিয়ে নয়। আমার জীবৎকালের মধ্যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে অন্য কোন সময়, অন্য কোন প্রসঙ্গে হয়ত সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে তোমাদের বলব। এখন আবার ফিরে আসা যাক বোর্ডিং-স্কুলের কথায়, সেই যে বোর্ডিং-স্কুল, ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের ফার্স্ট লাইনে আজ থেকে বছর চল্লিশেক আগে যেটা ছিল।

সেই বাড়িটা আজ আর তোমরা খুঁজে পাবে না। সেটা ছিল দোতলা, ওলন্দাজ টালি দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সদর দেউড়ি ছিল কাঠের তৈরি, রাস্তার দিকে মুখ করা। বার-বারান্দা থেকে রীতিমতো খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরতলায়। সেখানে আট-নয়টা ঘর। এক দিকের ঘরগুলোতে থাকত বোর্ডিং-স্কুলের মালিক, অন্য দিকের ঘরগুলোতে ক্লাস হত। নীচতলায়, বার-বারান্দার ডান দিকে ছিল ডর্মিটারি—বাচ্চাদের একসঙ্গে শোবার কয়েকটা ঘর, আর বাঁ ধারে থাকত দুই ওলন্দাজ বুড়ি, যাদের দুজনারই বয়স একশ পেরিয়ে গেছে; তারা জার পিটার দি গ্রেটকে স্বচক্ষে দেখেছে এমনকি তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছে।

ঐ বোর্ডিং-স্কুলে তিরিশ-চল্লিশটা ছেলে পড়াশুনো করত। তাদের মধ্যে আলিওশা নামে একটা ছেলেও ছিল। সেই সময় তার বয়স নয়-দশ বছরের বেশি ছিল না। ছেলেটার বাবা মা সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে অনেক অনেক দূরে থাকত। দুবছর আগে তারা তাকে রাজধানীতে নিয়ে এসে বোর্ডিং-স্কুলে রেখে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। বাঁধা হারে কয়েক বছরের আগাম খরচও তারা দিয়ে যায় মাস্টারমশাইকে। আলিওশা ছেলেটা ছিল বুদ্ধিমান, মিষ্টি চেহারার, পড়াশুনোয় ভালো। সবাই তাকে ভালোবাসত, আদর করত। কিন্তু তা হলে কী হবে, বোর্ডিং-স্কুলে কিন্তু প্রায়ই তার বড় একা-একা লাগত, এমন কি মাঝে মাঝে সে মনমরা হয়ে থাকত। বিশেষ করে নিজের মা-বাবার কাছ থেকে যে সে আলাদা হয়ে আছে এই চিন্তার সঙ্গে প্রথম প্রথম সে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারত না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে লাগল, এমন কি কখনও কখনও এমন মুহূর্তও আসত যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলতে খেলতে তার মনে হত মা-বাবার কাছে থাকার চেয়ে বোর্ডিং-স্কুলে মজা ঢের বেশি।

মোটের ওপর পড়াশুনোর দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে যেত, ভালোও লাগত, কিন্তু শনিবার হলেই তার বন্ধুবান্ধবদের সকলের মধ্যে যখন বাড়িতে, মা-বাবাদের কাছে যাবার ধুম লেগে যেত, তখন আলিওশা বড় বেশি করে টের পেত সে কত একা। রবিবার আর পালাপার্বণের ছুটিছাঁটার দিনগুলোতে সারা দিন তাকে একা একা কাটাতে হত, সেই সময় তার মনের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল বই পড়া। মাস্টারমশাই তার নিজের ছোটখাটো লাইব্রেরিটা থেকে বই নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন ওকে। সেকালে সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি চল ছিল বীরপুরুষদের গল্প আর অলৌকিক কাহিনী। আমাদের আলিওশা যেখান থেকে বই নিত সেই লাইব্রেরিরও বেশির ভাগ বই ছিল এ ধরনের।

তাই দশ বছর বয়স হতে না হতেই আলিওশার মুখস্থ হয়ে গেল অতি ডাকসাইটে সমস্ত বীরপুরুষের নানা কীর্তিকলাপ — অন্তত গল্প-উপন্যাসে যেমন ভাবে বর্ণনা করা আছে তেমনি ত বটেই। শীতকালের দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলিতে, রবিবার রবিবার আর অন্যান্য ছুটিছাঁটার দিনে তার প্রিয় কাজ ছিল সেই বহুযুগ আগের, সেকালের জগতে মনে মনে নিজেকে কল্পনা করা। বিশেষত লম্বা ছুটির সময় যখন সে প্রায়ই সারাদিন নিরিবিলি বসে থাকত, তখন তার ছেলেমানুষী কল্পনা বীরপুরুষদের দুর্গে দুর্গে, ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে কিংবা অন্ধকার নিবিড় বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত।

আমি তোমাদের বলতে ভুলে গেছি যে এই বাড়ির সঙ্গে ছিল একটা বেশ বড়সড় উঠোন। উঠোনটা জাহাজী কাঠের তক্তার বেড়া দিয়ে গলি থেকে আলাদা করা। রাস্তার মুখের বড় ফটক আর বেড়ার গায়ের দরজাটা সব সময় আগল দেওয়া থাকত। তাই গলিটা আলিওশার মনে দারুণ কৌতূহল জাগিয়ে তুললেও সেখানে যাওয়া তার পক্ষে কখনই সম্ভব হত না। খেলাধুলোর পিরিয়ডের সময় যখন তাকে উঠোনে খেলতে দেওয়া হত তখনই প্রথম যে কাজটা সে করত তা হল বেড়াটার দিকে ছুটে যাওয়া। ওখানে গিয়ে সে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াত, দেয়ালের গায়ে যে সমস্ত অসংখ্য গোল গোল ফুটো ছিল সেগুলোর ভেতর দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। আলিওশা জানত না যে এর আগে বজরা তৈরির জন্য তক্তার গায়ে যে-সমস্ত কাঠের গজাল মারা হয়েছিল তারই ফলে এই ফুটোগুলো হয়েছে। তার মনে হত যেন কোন এক ভালোমানুষ মায়াবিনী ইচ্ছে করে তারই জন্যে এই ফুটোগুলো তৈরি করেছে। সে কেবলই অপেক্ষা করে থাকত কবে সেই মায়াবিনীর আবির্ভাব ঘটবে গলিটাতে, ফুটোর ভেতর দিয়ে আলিওশার হাতে সে গুঁজে দেবে খেলনা কিংবা কবচ, কিংবা বাবা অথবা মা'র কাছ থেকে ছোট্ট একটা চিঠি। কতকাল যে তাদের কাছ থেকে কোন খবর সে পায় না! কিন্তু তার দারুণ আফশোস এই যে এমন কারোরই আবির্ভাব ঘটে না যাকে অন্তত দেখতে মায়াবিনীর মতো।

বেড়ার পাশে বিশেষ ভাবে তৈরি একটা ছোট ঘরে কিছু মুরগী থাকত। সারা দিন ধরে তারা উঠোনে খেলা করত, ছুটোছুটি করত। আলিওশার আরেকটা শখের কাজ ছিল এই

মুরগীগুলোকে খাওয়ানো। অতি সহজেই তাদের সঙ্গে আলিওশার আলাপপরিচয় হয়ে গেল, সে তাদের সবাইকে নামে জানত, ওদের মধ্যে মারামারি বেধে গেলে ছাড়িয়ে দিত আর ডানপিটেদের শাস্তি দিত—দুপুরের আর রাতের খাওয়াদাওয়ার পর টেবিলক্লথ ঝেড়েঝুড়ে রোজই খাবারের যে-সমস্ত গুঁড়ো সে নিয়ে আসত তা থেকে কখনও কখনও পরপর কয়েকদিন ওদের কিছুই দিত না। মুরগীদের মধ্যে বিশেষ করে সে ভালোবাসত কালোমানিক নামে ঝুঁটিওয়ালা একটা মুরগীকে। কালোমানিক আর সব মুরগীর চেয়ে বেশি আহ্লাদে গদগদ হয়ে পড়ত তাকে দেখে। এমন কি আলিওশাকে সে তার গায়ে হাত বুলাতে দিত। আলিওশাও তাই ভালো ভালো খাবারের টুকরোগুলো ওকে দিত। মুরগীটা ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের, অন্যদের সঙ্গে চলাফেরা করত কদাচিৎ, দেখেশুনে মনে হত নিজের বান্ধবীদের চেয়ে আলিওশাকেই যেন তার বেশি পছন্দ।

একবার (শীতকালের লম্বা ছুটির সময়কার ঘটনা এটা) দিনটা ছিল চমৎকার গরম!—শীতকালে সচরাচর এমন দেখা যায় না। এই রকম একটা দিনে আলিওশা বাইরে খেলার অনুমতি পেল। সেদিন মাস্টারমশাই আর তাঁর বৌ ভারী ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা স্কুল ইনস্পেক্টরের জন্য ভোজের আয়োজন করছিলেন। আগের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত বাড়ির সর্বত্র তাঁরা মেঝে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন, ধুলোবালি মুছলেন, মেহগনি কাঠের টেবিল আর দেরাজ আলমারীগুলো পালিশ দিয়ে চকচকে করলেন। মাস্টারমশাই নিজে কিনতে গেলেন ভোজের জন্যে খাবারদাবার — আর্খান্‌গেল্‌স্কের সাদা বাছুরের মাংস, বিশাল এক টুকরো হ্যাম আর কিয়েভের চিনিজারানো ফল। টেবিল সাজানোর ব্যাপারে আলিওশাও যথাসাধ্য সাহায্য করল। সাদা কাগজ কেটে হ্যামের টুকরোর জন্য সুন্দর একটা ঝালর বানানো আর এই উপলক্ষে বিশেষ ভাবে কেনা ছয়টা মোমবাতি কাটা কাগজের নক্সা দিয়ে সাজানো—এই ছিল ওর কাজ। নির্দিষ্ট দিনে খুব ভোরে নাপিত এলো, সে এসে মাস্টারমশাইয়ের টেরি, বাবরি আর কোঁকড়ানো চুলের ওপর তার কারিগরির পরিচয় দিল। তারপর সে পড়ল মাস্টারমশাইয়ের সহধর্মিণীকে নিয়ে, ভদ্রমহিলার ঢেউ খেলানো চুলে রাজ্যের লোশন আর পাউডার লাগাল, তার মাথার ওপর স্তূপাকার করে বসিয়ে দিল নানা রকম ফুলের গোটা একটা বাগান। ফুলগুলোর মাঝখানে জ্বলজ্বল করতে থাকল কায়দা করে বসানো দুটো বড় বড় হীরের আঙটি—ছাত্রদের মা-বাবারা কোন এক কালে তাঁর স্বামীকে উপহার দিয়েছিল। চুলের সাজ সারা হলে একটা পুরনো জরাজীর্ণ ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে তিনি ঘরের কাজ করতে চললেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভালোমতো নজরও রাখলেন যেন চুলের সাজটা কোনমতে নষ্ট না হয়ে যায়। এই কারণে তিনি নিজে রান্নাঘরে না ঢুকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাঁধুনিকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। তেমন প্রয়োজন হলে ওখানে পাঠাতে লাগলেন স্বামীকে, কেননা স্বামীর চুলের সাজ তাঁর নিজেরটার মতো অতটা চুড়ো করা নয়।

এই সব কাজকর্ম যখন চলছে তখন আমাদের আলিওশার কথা সবাই বেমালুম ভুলে গেল। এই সুযোগে সেও বাইরে খোলামেলা জায়গায় খেলতে চলে গেল। নিজের চিরকালের অভ্যাসমতো সে প্রথমে কাঠের বেড়াটার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফুটোর ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু এই দিনও গলি দিয়ে প্রায় কাউকেই যাতায়াত করতে দেখা গেল না। সে তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তার আদরের মুরগীগুলোর দিকে মনোযোগ দিল। একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর সে সবে বসেছে, মুরগীগুলোকে নিজের কাছে ডাকতে যাবে, এমন সময় পাশেই দেখতে পেল বড় একটা ছুরি হাতে রাঁধুনিকে। এই রাঁধুনিটাকে আলিওশা কোন কালে পছন্দ করত না — বদমেজাজী, মুখরা স্বভাবের। কিন্তু থেকে থেকে তার মুরগীরা যে সংখ্যায় কমে আসছে এর কারণ যে এই রাঁধুনিটাই এটা লক্ষ করার পর থেকে আলিওশা তাকে আরও কম পছন্দ করতে লাগল। একবার ঘটনাক্রমে তার বড় আদরের একটা সুন্দর মোরগকে কণ্ঠনালী কাটা অবস্থায় পায়ে ঝুলিয়ে রাখতে দেখে এই রাঁধুনি মহিলা সম্পর্কে আলিওশার মনে মনে একটা ভীতি ও বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এখন তাই ছুরি হাতে রাঁধুনিকে দেখামাত্রই সে অনুমান করতে পারল এর অর্থ কী হতে পারে। বন্ধুদের সাহায্য করার কোন শক্তি তার নেই বুঝতে পেরে তার মনে দুঃখ হল — সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে তক্ষুনি সেখান থেকে দূরে পালিয়ে গেল।

'আলিওশা, আলিওশা! মুরগীটা ধরতে আমাকে সাহায্য কর!' রাঁধুনি চিৎকার করে বলল।

কিন্তু আলিওশা আরও জোরে ছুটতে লাগল, মুরগীর ঘরের আড়ালে গিয়ে গা ঢাকা দিল। কখন যে তার চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল মাটিতে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, সে নিজেও লক্ষ করল না।

বেশ কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল মুরগীর ঘরের পাশে। রাঁধুনি যতক্ষণ উঠোনের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে কখনও মুরগীদের লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকছিল কখনও বা তাদের গালিগালাজ করে চলছিল ততক্ষণ আলিওশার বুকের ভেতরটা ভয়ানক ধড়াস ধড়াস শব্দে ওঠাপড়া করতে লাগল।

হঠাৎ আলিওশার বুকের ভেতরটা আরও জোরে ধড়াস ধড়াস করে উঠল: সে শুনতে পেল তার বড় আদরের কালোমানিকের গলা। মুরগীটা একেবারে মরিয়া হয়ে ক'কর-ক' চিৎকার ছাড়ছে। আলিওশার মনে হল সে যেন ডাক ছেড়ে বলছে:

ক'ক্ ক'ক্ ক'কর কোঁ-ও!
আলিওশা বাঁচাও-ও-ও!
ক'ক্ ক'ক্ ক'কর কোঁ-ও-ও,
কালোমানিক বলছে গো-ও-ও!

আলিওশা আর কিছুতেই নিজের জায়গায় থাকতে পারল না। সে জোরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রাঁধুনির দিকে ছুটে গেল। রাঁধুনি ততক্ষণে কালোমানিককে ডানা ধরে পাকড়াও করে ফেলেছে,

ঠিক সেই মুহূর্তে আলিওশা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

'ত্রিনুশ্‌কা, ও ত্রিনুশ্‌কা দয়া কর গো!' হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে সে চেঁচিয়ে বলল। 'আমার কালোমানিককে ধরো না!'

আলিওশা এমনই আচমকা রাঁধুনির ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল যে রাঁধুনির হাত থেকে কালোমানিক পড়ে গেল। কালোমানিকও এই সুযোগ ছাড়ল না। সে ভয় পেয়ে চালাঘরের ছাদের ওপর গিয়ে উড়ে বসল, সেখান থেকে ক'ক্‌ ক'ক্‌ ক'ক্‌ ক'কর কোঁও করে চলল। কিন্তু আলিওশার এখন মনে হল মুরগীটা যেন রাঁধুনিকে ভেঙাচ্ছে, ডাক ছেড়ে বলছে:

ক'ক্‌ ক'ক্‌ ক'কর কোঁ-ও!
দুয়ো তোরে দু-য়ো-ও!
ধরলি কোথায় ও-হো-হো,
ক'ক্‌ ক'ক্‌ ক'কর কোঁ-ও!

রাঁধুনি ততক্ষণে রাগে বিরক্তিতে জ্বলছে। তার ইচ্ছে ছিল মাস্টারমশাইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে ঘটনাটা বলে দেয়। কিন্তু আলিওশা তাকে ছাড়ল না। সে তার পোশাকের আঁচল আঁকড়ে ধরে রইল, এমন কাতরকণ্ঠে অনুনয় বিনয় করতে লাগল যে রাঁধুনি থতমত খেয়ে গেল।

'তুমি বড় ভালো গো ত্রিনুশ্‌কা!' আলিওশা বলল। 'তুমি এত ভালো, এত চমৎকার, তোমার মনটা এত ভালো... দোহাই তোমার, আমার কালোমানিককে ছেড়ে দাও! এই দেখ, তুমি যদি মুখ তুলে চাও তাহলে তোমাকে আমি কী দেব।'

আলিওশা পকেট থেকে বার করল একটা সোনার মোহর — তার একমাত্র সম্পত্তি। মোহরটাকে সে তার চোখের মণির মতো সযত্নে রক্ষা করে আসছিল, কেন না এটা ছিল তার ভালোমানুষ দিদিমার দেওয়া উপহার। রাঁধুনি সোনার মোহরটা আড়চোখে দেখে নিল, কেউ তাদের দেখছে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাড়ির জানলাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোহরটার দিকে হাত বাড়াল। মোহরটার জন্য আলিওশার খুবই আফশোস হচ্ছিল, কিন্তু কালোমানিকের কথা মনে হতে সে কোন রকম ইতস্তত না করে মহামূল্যবান উপহারটা দিয়ে দিল।

এই ভাবে নিষ্ঠুর ও নিশ্চিত মরণের হাত থেকে কালোমানিক উদ্ধার পেয়ে গেল।

রাঁধুনি যেই বাড়িতে চলে গেল, অমনি কালোমানিকও চালা থেকে উড়ে নেমে এসে আলিওশার দিকে ছুটে এলো। তাকে দেখে মনে হল সে যেন বুঝতে পেরেছে যে আলিওশা তার উদ্ধারকর্তা; তাই সে আলিওশার চারপাশে প্যাক খেতে লাগল, ডানা ঝাপটাল, ফুর্তিতে গলা ছেড়ে ক'কর কোঁ-ও করল। সারাটা সকাল সে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো আলিওশার পেছন পেছন উঠোনে ঘুরঘুর করতে লাগল, মনে হচ্ছিল সে যেন কিছু একটা বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। অন্তত আলিওশা কোন মতেই তার ক'কর কোঁ-ও-র অর্থ উদ্ধার করতে পারছিল না।

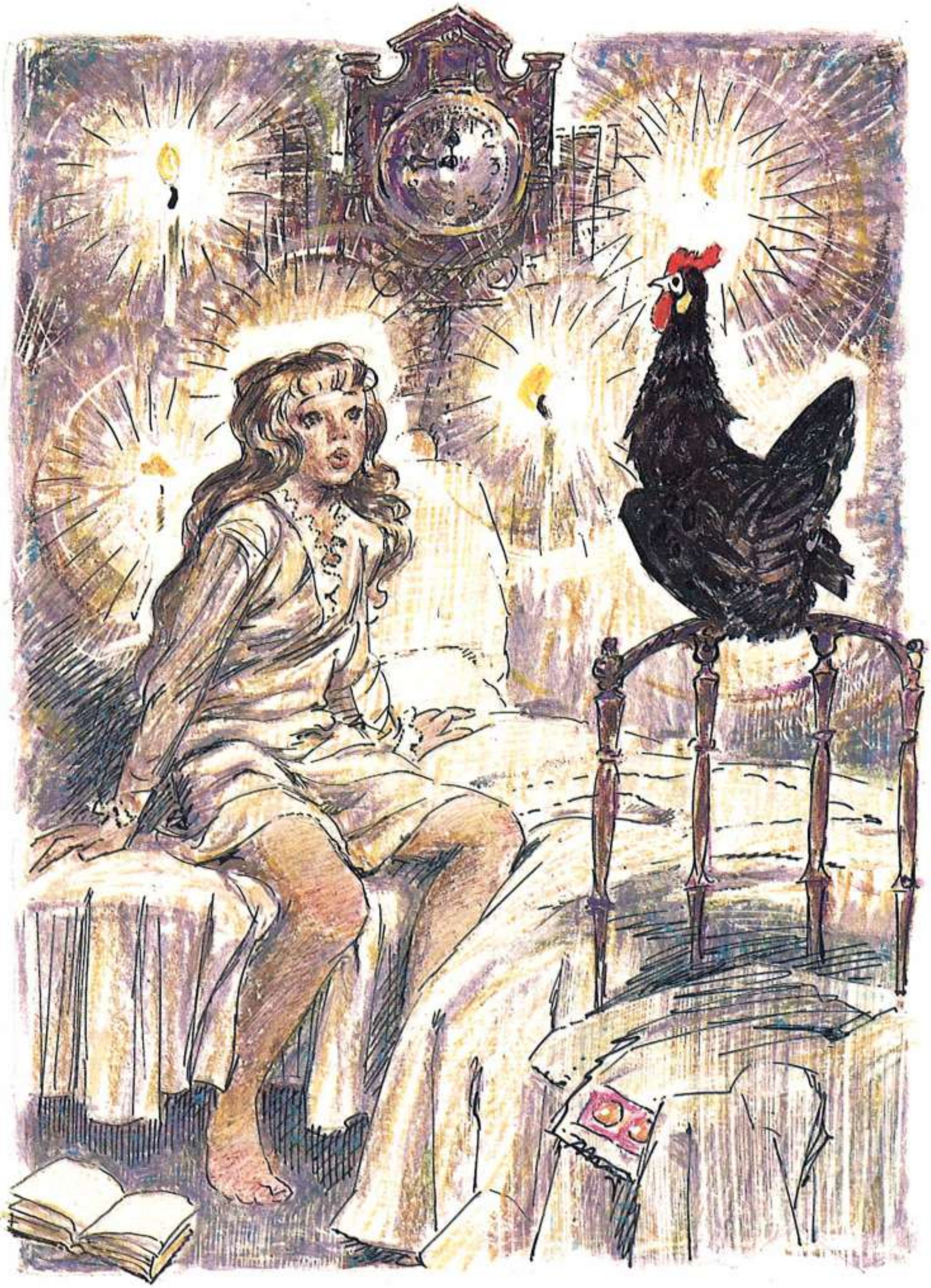

ভোজের দু'ঘণ্টা আগে থাকতে অতিথিরা আসতে শুরু করল। আলিওশাকে ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার গায়ে চড়ানো হল ছোট ছোট কুঁচি দেয়া কেম্ব্রিক কাপড়ের কাফ লাগানো গোল কলারের শার্ট, তাকে পরানো হল সাদা সালোয়ার, কোমরে জড়িয়ে দেওয়া হল নীল রেশমী কাপড়ের চওড়া বাঁধুনি। প্রায় কোমর পর্যন্ত ঝুলে থাকা তার লালচে লম্বা চুলের গোছা ভালো করে আঁচড়ে সমান দু'গোছা করে সামনে বুকের দু'পাশে ফেলে দেওয়া হল। তখনকার দিনে এটাই ছিল বাচ্চাদের সাজ।

তারপর সকলে তাকে শেখাল ইনস্পেক্টরমশাই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কী ভাবে হিল ঠুকতে হবে, কোন্ প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে।

অন্য সময় হলে ইনস্পেক্টর আসায় আলিওশা খুবই খুশি হত। অনেক দিন হল তাঁকে দেখার ইচ্ছে আলিওশার, কারণ মাস্টারমশাই আর মাস্টার-বৌ তাঁর কথা উঠলে যেমন ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়েন তা থেকে আলিওশা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিল উনি নির্ঘাত কোন নামজাদা বীরপুরুষ হবেন — তাঁর গায়ে চকচকে বর্ম, মাথায় বড় বড় পালকগোঁজা হেলমেট। কিন্তু এবারে আর তার তেমন কোন কৌতূহল দেখা গেল না — কৌতূহলের জায়গা তখন বিশেষ করে জুড়ে বসেছে কালো মুরগীর চিন্তা। তার চোখের সামনে কেবলই ভাসছিল মুরগীটার পেছন পেছন ছুরি হাতে রাঁধুনি তাড়া করছে, কালোমানিক নানা রকম স্বরে ক'কর কোঁ-ও করে চলেছে। তার ওপর আলিওশার বড় বিছছিরি লাগছিল এই ভেবে যে কালোমানিক তাকে কী বলতে চায় সে বুঝতে পারল না। তাই তার মন টানল মুরগীর ঘরের দিকে। কিন্তু কিছুই করার নেই — ভোজ কতক্ষণে শেষ হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে!

অবশেষে ইনস্পেক্টরমশাই এলেন। মাস্টার-বৌ অনেকক্ষণ হল জানলার ধারে বসে বসে যেদিক থেকে তাঁর আসার কথা সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। তিনিই ঘোষণা করলেন আগমন বার্তা।

চারদিকে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল: মাস্টারমশাই ধাঁ করে ছুটে গেলেন দরজার বাইরে, নীচে দেউড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। অতিথিরা তাদের জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন কি আলিওশাও মুহূর্তের জন্য তার মুরগীর কথা ভুলে গিয়ে বীরপুরুষ কী ভাবে তাঁর তেজী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেন দেখার জন্য জানলার ধারে এগিয়ে এলো। কিন্তু সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য তার হল না — ইনস্পেক্টরমশাই ততক্ষণে বাড়িতেই ঢুকে পড়েছেন। এদিকে দেউড়ির সামনে তেজী ঘোড়ার বদলে দাঁড়িয়ে আছে নেহাৎ মামুলি চেহারার একটা ঘোড়ায় টানা স্লেজগাড়ি। আলিওশা এতে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল, 'আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কক্ষনো ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যেতাম না, সব সময় যেতাম ঘোড়ার পিঠে চেপে!'

ততক্ষণে সবগুলো দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেছে, আর মাস্টার-বৌ মহামান্যবর অতিথির

আগমনপ্রতীক্ষায় তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিছু পরেই অতিথির আগমন ঘটল। প্রথমে মোটা চেহারার মাস্টার-বৌয়ের আড়ালে তাঁকে চোখে পড়ছিল না—মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন একেবারে দরজা জুড়ে। কিন্তু মাস্টার-বৌ যখন তাঁর দীর্ঘ নমস্কারের পালা চুকিয়ে, সচরাচর যেমন নীচু হতে হয় তার চেয়েও নীচু হয়ে হাঁটু ভাঙলেন তখন আলিওশা বেজায় অবাক হয়ে গেল—মাস্টার-বৌয়ের দেহের আড়াল থেকে সে যা দেখতে পেল তা পালকগোঁজা হেলমেট নয়, নেহাৎই সাধারণ একটা ছোট্ট টেকো মাথা, পাউডারে সাদা ধবধবে—সে মাথার একমাত্র শোভাবর্ধন করছে—অবশ্য আলিওশা এটা পরে লক্ষ করেছিল—ছোট এক গোছা চুল! তিনি যখন বৈঠকখানায় ঢুকলেন তখন আলিওশা আরও বেশি অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে ইনস্পেক্টরের গায়ে চকচকে বর্মের জায়গায় সাধারণ ছাইরঙা টেইল কোট থাকা সত্ত্বেও সবাই তাঁকে অসাধারণ সম্মান দেখাচ্ছে।

সে যাই হোক না, আলিওশার কাছে এসব যত অদ্ভুতই ঠেকুক না কেন, অন্য সময় হলে টেবিলের এরকম অসাধারণ পারিপাট্য দেখে তার যত উল্লসিত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, এই দিন কিন্তু সে এ দিকে বড় একটা দৃষ্টি দিল না। তার মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরঘুর করছে কালোমানিককে নিয়ে সকালের ঘটনাটা। শেষপাতে পরিবেশন করা হল মিষ্টি—চিনিতে জারানো নানা রকমের ফল, আপেল, নাশপাতি, খেজুর, কিশমিশ আর আখরোট। কিন্তু তখনও সে তার মুরগীর চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে পারল না। যেই সকলে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল অমনি সে দুরু দুরু বুকে, মনে মনে আশা নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল বাইরে গিয়ে খেলতে পারে কিনা।

'যাও,' মাস্টারমশাই বললেন, 'তবে বেশিক্ষণ থেকো না কিন্তু। শিগগিরই অন্ধকার হয়ে আসবে।'

আলিওশা তার কাঠবেড়ালির লোমের লাইনিং দেওয়া লাল ওভারকোট আর নেউলের লোমের ঘের দেওয়া সবুজ মখমলি টুপি পরে বেড়ার দিকে ছুটে গেল। সে যখন ওখানে এলো ততক্ষণে মুরগীর দল রাতের আশ্রয় নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাদের ঘুম পেয়েছে, তাই আলিওশা খাবারের যে গুঁড়োগুলো নিয়ে এসেছিল তা দেখে তারা তেমন একটা উল্লসিত হল না। দেখা গেল একমাত্র কালোমানিকেরই ঘুমের ইচ্ছে নেই—সে খুশিমনে তার কাছে ছুটে এলো, ডানা ঝাটপটিয়ে এবারেও কঁকর কোঁ-ও শুরু করল। আলিওশা অনেকক্ষণ তার সঙ্গে খেলা করল। শেষকালে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে বাড়ি যাবার সময় হতে আলিওশা নিজ হাতে মুরগীর ঘর বন্ধ করে দিল, বন্ধ করার আগে ভালো করে দেখে নিল তার আদরের মুরগীটা দাঁড়ের ওপর বসতে পেরেছে কিনা। সে যখন ওখান থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তার মনে হল কালোমানিকের চোখজোড়া যেন অন্ধকারের মধ্যে তারার মতো জ্বলজ্বল করছে, যেন সে মৃদুস্বরে আলিওশাকে বলছে:

'আলিওশা! আলিওশা! আমার সঙ্গে থেকে যাও।'

আলিওশা বাড়ি ফিরে সারাটা সন্ধ্যা একা একা ক্লাসরুমে বসে বসে কাটিয়ে দিল। তখনও কিন্তু, দশটার পরও বাড়ির অন্য অর্ধেক অংশে অতিথিরা রয়েই গেছে। তারা সবাই চলে যাওয়ার আগেই আলিওশা নীচের তলায় শোবার ঘরে গিয়ে জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল, আলো নিভিয়ে দিল। অনেকক্ষণ সে ঘুমোতে পারল না। অবশেষে ঘুম আর বাধা মানল না, স্বপ্নে সে সবে কালোমানিকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে এমন সময় দুর্ভাগ্যবশত অতিথিদের চলে যাবার হৈচৈতে তার ঘুম ভেঙে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে ইনস্পেক্টরকে মোমবাতির আলো দেখিয়ে বিদায় দেওয়ার পর মাস্টারমশাই আলিওশার ঘরে ঢুকলেন, সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে তিনি চলে গেলেন।

জোছনা রাত। জানলার খড়খড়িগুলো আঁটসাঁট ভাবে বন্ধ না থাকায় তার ভেতর দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো ঘরে এসে পড়ছিল। আলিওশা চোখ খুলে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগল তার মাথার ওপর, ওপরতলার ঘরগুলোতে লোকজন চলাফেরা করছে, টেবিল-চেয়ার সরিয়ে ঠিক জায়গায় রাখছে।

শেষকালে সব নিঝুম। আলিওশার পাশের খাটের ওপর জোছনার সামান্য আলো এসে পড়েছে। খাটটার দিকে তাকাতেই সে লক্ষ করল প্রায় মেঝে অবধি ঝুলে-থাকা সাদা চাদরটা একটু একটু নড়ছে। সে আরও চোখ বড় বড় করে নিরীক্ষণ করতে লাগল... তার কানে এলো খাটের নীচে কে যেন খচরমচর করছে, আরও খানিকক্ষণ বাদে মনে হল কে যেন নীচু গলায় তাকে ডাকছে:

'আলিওশা, আলিওশা!'

আলিওশা ভয় পেয়ে গেল। সে ত একাই এ ঘরে ছিল। তক্ষুনি তার মাথায় এই চিন্তা খেলল যে খাটের নীচে নিশ্চয়ই কোন চোর ঘাপটি মেরে আছে। কিন্তু পরে সে বিবেচনা করে দেখল যে চোর হলে তার নাম ধরে ডাকত না। একথা ভেবে মনে মনে খানিকটা উল্লসিত হয়ে উঠলেও তার বুক কাঁপতে লাগল। সে নিজের বিছানার ওপর শরীরটা সামান্য ওঠাল, আরও স্পষ্ট করে দেখতে পেল যে চাদরটা নড়ছে, আরও পরিষ্কার শুনতে পেল কে যেন বলছে:

'আলিওশা, আলিওশা!'

হঠাৎ সাদা চাদরটা সামান্য উঠে গেল, আর তার নীচ থেকে বেরিয়ে এলো... কে? না, সেই কালো মুরগী!

'আচ্ছা! কালোমানিক, তুমি!' আলিওশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল উল্লাসধ্বনি। 'এখানে কী করে এলে?'

কালোমানিক ডানা ঝটপট করে আলিওশার খাটের ওপর উড়ে এসে মানুষের গলায় বলল: 'হ্যাঁ আমি, আলিওশা! তুমি আমাকে ভয় কর না, তাই না?'

'তোমাকে ভয় করতে যাব কেন?' সে উত্তর দিল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তবে কিনা আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই দেখে যে তুমি এত ভালো কথা বলতে পার। আমি মোটেই জানতাম না যে তুমি কথা বলতে জান।'

মুরগী তখন বলল, 'যদি তুমি আমাকে ভয় না কর তাহলে আমার সঙ্গে চলে এসো। চটপট জামাকাপড় পরে নাও!'

'হাসালে তুমি, কালোমানিক!' আলিওশা বলল। 'অন্ধকারের মধ্যে আমি জামাকাপড় পরব কী করে? আমি এখন আমার পোশাক খুঁজেই পাব না, তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি অনেক কষ্টে।'

'এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব,' মুরগী বলল।

এই বলে সে অদ্ভুত স্বরে ক'কর কোঁ-ও করে উঠল, অমনি কোথা থেকে কে জানে এসে হাজির হল রুপোর বাতিদানে কতকগুলো ছোট ছোট মোমবাতি—মোমবাতিগুলো আলিওশার কড়ে আঙুলের চেয়ে বেশি বড় হবে না। বাতিদানগুলো একের পর এক এসে পড়তে লাগল মেঝেতে, চেয়ারে, জানলার তাকে এমন কি হাতধোয়ার বেসিনের ওপরে, আর তাতে ঘরের ভেতরটা এত আলোয় আলোময় হয়ে উঠল যে মনে হল যেন দিনের বেলা। আলিওশা জামাকাপড় পরতে শুরু করল, মুরগী ওর হাতে পোশাক তুলে দিল। এইভাবে চটপট তার পুরোদস্তুর জামাকাপড় পরা হয়ে গেল।

আলিওশা যখন তৈরি হয়ে গেছে তখন কালোমানিক ফের ক'কর কোঁ করে ডেকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিগুলোও উধাও হয়ে গেল।

'আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো,' কালো মুরগী ওকে বলল।

আলিওশাও সাহসে ভর করে তার পেছন পেছন চলল। মুরগীর চোখ থেকে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছিল, তাতে ওদের চারপাশের সমস্ত কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠছিল, যদিও ছোট ছোট মোমবাতির মতো অত উজ্জ্বল সে আলো নয়। তারা সামনের বড় ঘর পেরিয়ে গেল।

'দরজা চাবি দিয়ে বন্ধ আছে,' আলিওশা বলল।

কিন্তু মুরগী কোন জবাব দিল না। সে ডানা ঝটপটাল, দরজা সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি খুলে গেল। তারপর বারবারান্দা পেরিয়ে তারা মোড় নিল একশ' বছরের দুই ওলন্দাজ বুড়িদের ঘরগুলোর দিকে। আলিওশা ওদের ওখানে কোন দিন যায় নি, কিন্তু শুনেছে যে তাদের ঘরদোর সাবেকি ধরনে সাজানো, তাদের একজনের আছে একটা ছাইরঙা বড় তোতাপাখি, আর অন্য জনের আছে একটা ছাইরঙা বেড়াল—খুবই তার বুদ্ধি, হুপের ভেতর দিয়ে লাফাতে পারে, লোকের হাতে থাবা তুলে দিতে পারে। আলিওশার বহুদিনের ইচ্ছে এসব নিজের চোখে

দেখে। তাই মুরগী আরও একবার ডানা ঝটপটালে বুড়িদের মহলের দরজা যখন খুলে গেল তখন তার খুশির আর অন্ত রইল না।

আলিওশা প্রথম ঘরে দেখতে পেল নানা ধরনের সেকেলে আসবাবপত্র — কুঁদে গড়া চেয়ার, আরাম কেদারা, টেবিল আর দেরাজ আলমারি। ওলন্দাজ টালির তৈরি একটা বিশাল চুল্লি, তার ওপর বড় তক্তপোষ। চুল্লির টালির গায়ে নীল রঙে আঁকা মানুষ আর জন্তুজানোয়ার। আলিওশার ইচ্ছে ছিল থেমে দাঁড়িয়ে আসবাবপত্র, বিশেষত চুল্লি-তক্তপোষের গায়ে আঁকা মূর্তিগুলো ভালো করে দেখে। কিন্তু কালোমানিক তাকে দেখতে দিল না।

ওরা পরের ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল, এখানেই আলিওশার খুশি হওয়ার কারণ ছিল। চমৎকার সোনার খাঁচায় বসে ছিল লাল লেজওয়ালা ছাইরঙা বড় তোতাপাখি। আলিওশার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হল পাখিটার দিকে ছুটে যায়। এবারেও কালোমানিক তাকে আটকাল।

'এখানে কিছু ছুঁয়ো না,' সে বলল। 'বুড়ো মানুষদের জাগাতে যেয়ো না।'

তখনই আলিওশা লক্ষ করল যে তোতাপাখির পাশে আছে সাদা মসলিন পর্দায় ঢাকা একটা খাট। মসলিনের পর্দার ভেতর থেকে সে দেখতে পেল শুয়ে আছে এক বুড়ি, তার চোখ বোজা। আলিওশার মনে হল বুড়ি যেন মোমের তৈরি। আরেক কোণে ছিল হুবহু ঐ রকম আরেকটা খাট। সেখানে ঘুমিয়ে ছিল আরেকজন বুড়ি। ছাইরঙা একটা বেড়াল সেই খাটের পাশে বসে বসে সামনের দুই থাবা দিয়ে মুখ ধুচ্ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আলিওশা আর লোভ সামলাতে না পেরে তার থাবা ধরার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দিল... অমনি বেড়ালটা জোরে মিউ মিউ ডাক ছেড়ে উঠল, তোতাপাখিটাও মাথার ঝুঁটি ফুলিয়ে জোর গলায় চেঁচাতে শুরু করল: 'বেঅকুব! বেঅকুব!' ঠিক সেই সময় সাদা মসলিনের পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা গেল বুড়ি দু'জন বিছানায় উঠে বসেছে। কালোমানিক চটপট ছুট দিল, আলিওশাও ছুটল তার পিছু পিছু, তারা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে দরজা দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল। এর পরও অনেকক্ষণ ধরে শোনা যেতে লাগল তোতাপাখিটার চিৎকার: 'বেঅকুব! বেঅকুব!'

'লজ্জা করে না তোমার!' বুড়িদের ঘর থেকে দূরে চলে আসার পর কালোমানিক বলল। 'তুমি বোধহয় বীরপুরুষদের জাগিয়েই দিলে।'

'কোন্ বীরপুরুষদের?' আলিওশা জিজ্ঞেস করল।

'দেখতে পাবে,' মুরগী উত্তর দিল। 'তা হোক গে, ভয় করো না, ও কিছু নয়, সাহস করে আমার পিছু পিছু চলে এসো।'

তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে একটা পাতাল কুঠুরির মতো জায়গায় নেমে এলো। নানা রকম অলিগলি আর সরু পথ ধরে তারা অনেকক্ষণ চলল। এরকম পথ আলিওশা এর আগে আর কখনও দেখে নি। জায়গায় জায়গায় এই ফালি পথগুলো এত সরু আর মাথার ওপরকার ছাদ

এত নীচু যে আলিওশাকে মাথা নীচু করতে হচ্ছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ তারা এসে পড়ল একটা বড় ঘরে, তিনটে বড় বড় স্ফটিক-ঝাড়ের আলোয় ঝলমল করছে ঘরটা। ঘরে কোন জানলা ছিল না, দেয়ালের দু'ধারে ঝুলছে বীরপুরুষদের মূর্তি। তাদের গায়ে ঝকঝকে বর্ম, মাথায় বড় বড় পালকগোঁজা হেলমেট, লোহার হাতে বর্শা আর ঢাল।

কালোমানিক পা টিপে টিপে আগে আগে চলতে লাগল, আলিওশাকে বলল চুপে চুপে তার পিছু পিছু আসতে।

বড় ঘরটার শেষে ছিল উজ্জ্বল হলুদ তামার একটা বড় দরজা। তার কাছাকাছি আসতেই দুটো বীরপুরুষ দেয়ালের গা থেকে লাফিয়ে নেমে এসে ঢালের ওপর বর্শার ঘা মেরে ঝনঝন আওয়াজ তুলে কালো মুরগীর দিকে ধেয়ে গেল। কালোমানিক ঝুঁটি ফুলিয়ে ডানা ছড়াল, দেখতে দেখতে সে মস্ত বড়, বীরপুরুষদের চেয়েও মাথায় উঁচু হয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিল। বীরপুরুষ দু'জন তার ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাতে লাগল, এদিকে সেও ডানা আর ঠোঁট দিয়ে আত্মরক্ষা করে চলল। আলিওশার দারুণ ভয় হল, তার বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ড এত জোরে ওঠা পড়া করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে আসার পর সে দেখতে পেল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘরে পড়েছে আর সে শুয়ে আছে তার নিজের বিছানায়। কালোমানিক বা বীরপুরুষ — কারোই দেখা নেই। আলিওশা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধাতস্থ হতে পারল না। সে বুঝতে পারছিল না রাতে তার কী হয়েছিল। যা যা দেখেছে সে সব কি স্বপ্নে, নাকি সত্যি সত্যিই ঘটেছিল? সে জামাকাপড় পরে ওপরে চলে গেল, কিন্তু গতকাল রাতে সে যা দেখেছিল তা তার মাথা থেকে যাচ্ছিল না। সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন বাইরে বেরিয়ে খেলা করা যাবে। কিন্তু ওকে জব্দ করার জন্যই যেন সেদিন সমানে প্রচন্ড বরফ পড়তে লাগল, বাড়ি থেকে বেরোবার কথা চিন্তাই করা যায় না।

দুপুরের খাবার সময় এটা ওটা কথাপ্রসঙ্গে মাস্টার-বৌ তাঁর স্বামীকে জানালেন যে কালো মুরগীটা কোথায় যেন গিয়ে লুকিয়েছে।

তিনি আরও বললেন, 'অবশ্য ওটা গেলেও বিশেষ দুঃখ করার নেই — বহুকাল আগেই রান্নার জন্য ওটাকে ঠিক করে রাখা। ব্যাপারটা ভেবেই দেখ না, আমাদের বাড়িতে যতদিন আছে তার মধ্যে একটা ডিমও পাড়ে নি।'

আলিওশা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি, যদিও তার মনে হল ওকে কোথাও না পেলে বরং ভালোই, রান্নাঘরে গিয়ে পড়ার চেয়ে ভালো।

খাওয়াদাওয়ার পর আলিওশা আবার একা একা রয়ে গেল ক্লাসঘরে। গত রাতের ঘটনা সে সমানে ভেবে চলল। আদরের কালোমানিককে হারানোর কথা ভেবে সে কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল মুরগীর ঘর থেকে উধাও হয়ে গেলে কী হবে, আসছে

রাতে কালোমানিকের সঙ্গে নির্ঘাত তার দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু পরে তার মনে হল এটা সম্ভব নয়, আর একথা মনে হতে সে আবার বিষাদে ডুবে গেল।

ঘুমনোর সময় হয়ে গেল। আলিওশাও অধীর আগ্রহে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পাশের খাটটার দিকে দৃষ্টি পড়তে না পড়তে ফের মৃদু চাঁদের আলোয় সে দেখতে পেল ঠিক আগের রাতের মতো আজও নড়েচড়ে উঠছে সাদা চাদরটা। এবারেও সে শুনতে পেল কণ্ঠস্বর — কে যেন তাকে ডাকছে, 'আলিওশা! আলিওশা!' আর কিছুক্ষণ বাদেই খাটের নীচ থেকে কালোমানিক বেরিয়ে উড়ে এসে বসল তার বিছানায়।

'ওঃ! এই যে কালোমানিক!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে গলা ছেড়ে সে বলল। 'আমার ভয় হচ্ছিল আর বোধহয় কখনও তোমার দেখা পাব না। ভালো আছ ত?'

'ভালো আছি,' মুরগী বলল, 'কিন্তু তোমার কৃপায় আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি।'

'সে কী বলছ কালোমানিক?' আলিওশা আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

মুরগী বলল, 'তুমি ছেলেটা ভালোই, কিন্তু তুমি ছটফটে স্বভাবের, তোমাকে যা যা বলা হয় সব ঠিক ঠিক শোন না, এটা মোটেই ভালো নয়! গতকাল আমি তোমাকে বললাম বুড়িদের ঘরে কিছু ছুঁয়ো না, কিন্তু তুমি নিজেকে সামলাতে পারলে না, বেড়ালের থাবা নিজের হাতের মধ্যে ধরার জন্যে বেড়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। বেড়াল জাগিয়ে দিল তোতাপাখিকে, তোতাপাখি — বুড়িদের, বুড়িরা — বীরপুরুষদের। আর বীরপুরুষদের কাবু করতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে!'

'আমারই দোষ, কালোমানিক আমার, আর অমন হবে না। দোহাই তোমার, আজ আমাকে ফের ওখানে নিয়ে চল। তুমি দেখতে পাবে আমি কেমন বাধ্য ছেলে।'

'ভালো কথা,' মুরগী বলল, 'দেখাই যাবে।'

মুরগী তখন 'আগের দিনের মতন ক'কর কোঁ-ও করে উঠল, আবার দেখা দিল রুপোর বাতিদানে সেই ছোট ছোট মোমবাতি। আলিওশা আবার জামাকাপড় পরে চলল মুরগীর পেছন পেছন। আবার তারা এসে ঢুকল বুড়িদের ঘরে, কিন্তু এবারে আর আলিওশা কিছুই ছুঁল না।

প্রথম ঘরটার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল যে চুল্লি-তক্তপোষের গায়ে আঁকা মানুষ আর জন্তুজানোয়াররা নানা রকম মজার মজার মুখভঙ্গি করে ইশারায় তাকে নিজেদের কাছে ডাকছে। কিন্তু আলিওশা ইচ্ছে করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। দ্বিতীয় ঘরটাতে ওলন্দাজ বুড়িদু'জন আগের দিনকার মতোই বিছানায় শুয়ে ছিল মোমের মূর্তির মতো। তোতাপাখি আলিওশার দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করল, ছাইরঙা বেড়ালটা এবারেও সামনের দুই থাবা দিয়ে মুখ ধুচ্ছিল। টেবিলের ওপরে আয়নার সামনে আলিওশা দেখতে পেল দুটো চীনামাটির চীনের পুতুল। গতকাল এগুলো ওর চোখে পড়ে নি। পুতুলদুটো আলিওশার

দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নমস্কার জানাল। কিন্তু কালোমানিকের নির্দেশ মনে পড়ে যেতে সে আর না থেমে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবে যেতে যেতে সে তাদের উদ্দেশে নীচু হয়ে নমস্কার জানানোর লোভটা সামলাতে পারল না। পুতুলদুটো তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে এসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে তাদের পিছন পিছন ছুটল। ওরা তার কাছে এত মজার মনে হচ্ছিল যে আরেকটু হলেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত, কিন্তু কালোমানিক তার দিকে এমন কটমট করে তাকাল যে আলিওশার হুঁশ ফিরে এলো। পুতুলদুটো দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিল, কিন্তু আলিওশা তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না দেখে আবার ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়।

আবার তারা সিঁড়ি বয়ে নীচে নামল, ছোট ছোট অলিগলি আর পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছুল তিনটি স্ফটিকের ঝাড়ের আলোয় ঝলমলে সেই ঘরটাতে। সেই একই বীরপুরুষের দল ঝুলছিল দেয়ালের গায়ে, এবারেও তারা যখন হলদে তামার দরজাটার সামনে এলো তখন দু'জন বীরপুরুষ দেয়ালের গা থেকে নেমে এসে তাদের পথ আটকাল। তবে এবারে তাদের যেন আগেকার মতো রাগী মনে হচ্ছে না। তারা কোন রকমে পা টেনে টেনে চলছিল, দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে অনেক কষ্টে হাতের বর্শা ধরে রেখেছে।

কালোমানিক দেখতে দেখতে বিরাট মূর্তি ধরে মাথার ঝুঁটি ফোলাল। যেই ডানা দিয়ে তাদের গায়ে ঘা মারল অমনি তারা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে গেল, আলিওশা দেখতে পেল সেগুলো ফাঁকা বর্ম মাত্র! তামার দরজাটা আপনাআপনি খুলে গেল, আলিওশারা আরও এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরে তারা গিয়ে ঢুকল আরও একটা বড় ঘরে। ঘরটা বড়সড়, কিন্তু এতই নীচু যে আলিওশা হাত দিয়ে ঘরের ছাদ ছুঁতে পারে। এই ঘরটা আলিওশা তার নিজের ঘরে যে রকম ছোট ছোট মোমবাতি দেখেছিল সেই রকম মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে, কিন্তু এখানকার বাতিদানগুলো রুপোর নয়, সোনার।

আলিওশাকে এখানে রেখে চলে গেল কালোমানিক।

'এখানে একটুখানি থাক,' সে বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি। আজকে তুমি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, যদিও চীনেমাটির পুতুলগুলোর দিকে ফিরে মাথা নাড়িয়ে ঠিক কাজ কর নি। মাথা যদি না নাড়তে তা হলে বীরপুরুষদু'জন দেয়ালের গায়ে থেকে যেত। যা হোক, তুমি আজ বুড়িদের জাগিয়ে দাও নি, তাই বীরপুরুষদের গায়ে কোন জোরই ছিল না।' এই বলে কালোমানিক ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আলিওশা এখন একা। সে মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বিরাট ঘরটা। ঘরটা দামী দামী জিনিস দিয়ে সাজানো গোছানো। তার মনে হল দেয়ালগুলো যেন মর্মরপাথরের। এমন মর্মরপাথর সে বোর্ডিং-স্কুলের খনিজদ্রব্যের ঘরে দেখেছে। দেয়ালের কারুকাজ আর

দরজাগুলো খাঁটি সোনার। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা সবুজ চাঁদোয়ার নীচে, উঁচু মঞ্চের মতো জায়গায় ছিল একটা সোনার চেয়ার। এই সজ্জাটা আলিওশা খুবই মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, কিন্তু তার অবাক লাগছিল এই ভেবে যে সব জিনিস এতই খুদে যে মনে হচ্ছিল যেন ছোট পুতুলদের জন্য।

সে যখন কৌতূহলভরে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সেই সময় পাশের একটা দরজা খুলে গেল। এই দরজাটা আগে সে লক্ষ করে নি। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল অজস্র খুদে খুদে লোক, লম্বায় তারা কেউ হাতখানেকের বেশি হবে না। পরনে তাদের রঙবেরঙের জমকাল পোশাক। তাদের চেহারাও জমকাল — কারও কারও সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছিল যোদ্ধা, কেউ বা বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের মতো দেখতে। তাদের সকলেরই মাথায় স্পেনীয় ধরনের গোল টুপি — পালকগোঁজা। আলিওশাকে তারা লক্ষ করল না, গম্ভীর ভাবে তারা এ ঘর ও ঘর করে বেড়াতে লাগল, নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু ওরা কী যে বলছিল আলিওশা বুঝতে পারল না।

অনেকক্ষণ সে চুপচাপ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু যেই প্রশ্ন করার জন্যে ওদের একজনের দিকে এগোতে যাবে অমনি ঘরের শেষ দিকের বড় দরজাটা খুলে গেল, সবাই কথা বন্ধ করে দুই সারি দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথার টুপি খুলল।

চোখের পলকে ঘরটা হয়ে উঠল আরও আলোঝলমলে, ছোট ছোট মোমবাতিগুলো জ্বলে উঠল আরও উজ্জ্বল হয়ে, আর আলিওশা দেখতে পেল বিশজন খুদে খুদে বীরপুরুষকে। তাদের গায়ে সোনার বর্ম, মাথায় টকটকে লাল রঙের পালকগোঁজা শিরস্ত্রাণ। তারা নিঃশব্দে মার্চ করে জোড়ায় জোড়ায় এসে ঢুকতে লাগল বড়ঘরটায়। তারপর গভীর নীরবতার মধ্যে তারা এসে দাঁড়াল আরামকেদারার দু'ধারে। কিছুক্ষণ বাদে বড়ঘরে যিনি এসে ঢুকলেন তাঁর ভাবভঙ্গি রাজকীয় — মাথায় ঝলমলে মণিমুক্তার কাজ করা রাজমুকুট। তাঁর গায়ে ইঁদুরের লোমের আস্তরণ লাগানো হালকা সবুজ রঙের আঙরাখা। আঙরাখার পেছনের লম্বা ধারটা তুলে বয়ে নিয়ে চলছিল বিশজন ছোট ছোট অনুচর। তাদের গায়ে গাঢ় লাল রঙের পোশাক।

আলিওশা তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল ইনি রাজা না হয়ে যান না। সে মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্ণিশ করল। রাজা তার কুর্ণিশের জবাবে মিষ্টি হাসি হেসে সোনার কেদারায় গিয়ে বসলেন। এরপর রাজার কাছাকাছি যে বীরপুরুষরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজনকে ডেকে তিনি কী যেন হুকুম দিলেন। বীরপুরুষটি আলিওশার কাছে এগিয়ে এসে তাকে কেদারার কাছাকাছি যেতে বলল। আলিওশা তার অবাধ্য হল না।

রাজা বললেন, 'আমি অনেককাল হলই জানতাম যে তুমি ভালো ছেলে। কিন্তু গত পরশুর আগের দিন আমার প্রজাদের জন্য একটা মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি — এর জন্য তুমি পুরস্কার

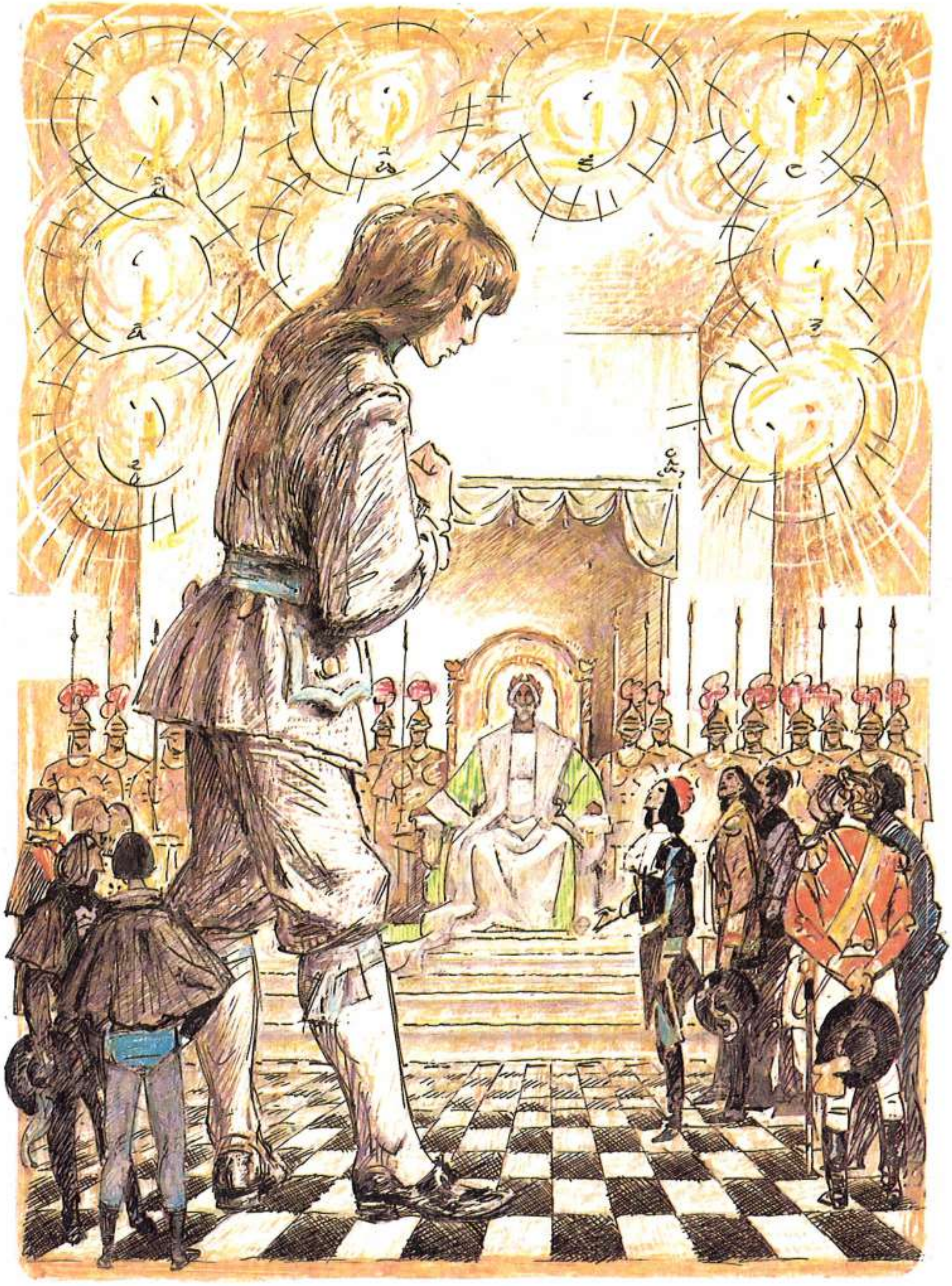

পাবার যোগ্য। আমার প্রধানমন্ত্রী আমাকে জানিয়েছে যে তুমি তাকে নিশ্চিত ও নিষ্ঠুর মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।'

'কখন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আলিওশা।

'পরশুর আগের দিন, বাড়ির আঙিনায়,' রাজা বললেন। 'এই যে সেই লোক যে তার প্রাণের জন্য তোমার কাছে ঋণী।'

রাজা যাকে দেখিয়ে দিলেন আলিওশা তার দিকে তাকাল, আর কেবল তখনই তার চোখে পড়ল যে রাজার সভাসদদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আগাগোড়া কালো পোশাক পরা একটা খুদে লোক। তার মাথায় গাঢ় লাল রঙের এক বিশেষ ধরনের টুপি — ওপরটা খাঁজ কাটা কাটা; টুপিটা সামান্য কাত করে পরা। তার গলায় সাদা রঙের রুমাল — এত বেশি কলপ দেওয়া যে সামান্য নীল-নীল মনে হয়। লোকটা আলিওশার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসি হাসল। আলিওশার মনে হল মুখটা যেন চেনা-চেনা, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে।

এমন একটা মহৎ কাজের সঙ্গে তাকে জড়ানোয় আলিওশার মনে মনে যত আহ্লাদই হোক না কেন সে সত্যি কথা ভালোবাসত, তাই নীচু হয়ে কুর্ণিশ করে বলল:

'রাজামশাই! আমি যা কখনও করি নি তার জন্য নিজের কৃতিত্ব আমি দাবি করতে পারি না। গত পরশুর আগের দিন যাকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তিনি আপনার মন্ত্রী নন, সে হল আমাদের কালো মুরগী। মুরগীটা একটাও ডিম দেয় নি বলে রাঁধুনি তাকে পছন্দ করত না।'

'বলছ কী হে তুমি!' রাজা রাগে জ্বলে উঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন। 'আমার মন্ত্রী মুরগী নয়, সম্মানীয় রাজপুরুষ!'

এই সময় মন্ত্রী আরও এগিয়ে এলো, আলিওশা দেখতে পেল আসলে সে তার আদরের কালোমানিকই বটে। আলিওশা খুব খুশী হয়ে রাজার কাছে ক্ষমা চাইল, যদিও সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এর অর্থ কী।

'বল আমাকে, তোমার কী চাই,' রাজা বললেন। 'আমার সামর্থ্য থাকলে তোমার ইচ্ছে অবশ্যই পূরণ করব।'

'সাহস করে বলে ফেল আলিওশা!' মন্ত্রী তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল।

আলিওশা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল, সে বুঝতে পারছিল না কী চাওয়া যায়। তাকে আরেকটু বেশি সময় দিলে সে হয়ত ভেবেচিন্তে ভালো একটা কিছু বার করতে পারত; কিন্তু রাজাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা অভদ্রতা দেখায় মনে করে সে চট করে উত্তর দিয়ে বসল।

সে বলল, 'আমি চাই আমি যেন পড়াশুনো না করেই যখন আমাকে যা শিখতে দেওয়া হয় জেনে ফেলি।'

'তুমি যে এত কুঁড়ে তা আমার জানা ছিল না,' রাজা মাথা নেড়ে বললেন। 'কিন্তু কিছু করার নেই, কথা আমাকে রাখতেই হবে।'

তিনি একটা হাত নাড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুচর নিয়ে এলো একটা সোনার থালা। থালার ওপর ছিল একটা শণের বীচি।

'এই বীচিটা নাও,' রাজা বললেন। 'এটা যতক্ষণ তোমার কাছে থাকবে ততক্ষণ তোমাকে যাই শিখতে দেওয়া হোক না কেন তোমার জানা থাকবে। তবে একটা শর্ত—এখানে তুমি যা দেখলে কিংবা এর পরও যা দেখতে পাবে সে সম্পর্কে একটি কথাও কোন মতেই কারও কাছে বলা চলবে না। এর এক চুল এদিক ওদিক হলে আমাদের দরদ তুমি চিরকালের জন্য হারাবে, আমাদেরও অজস্র ঝঞ্ঝাট আর দুর্গতির একশেষ হবে।'

আলিওশা শণের বীচিটা নিয়ে কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল, কথা দিল যে চুপচাপ থাকবে, এই নিয়ে বড়াই করবে না। রাজা এরপর আরামকেদারা থেকে উঠে পড়ে যে ভাবে এসেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে মন্ত্রীকে হুকুম দিয়ে গেলেন আলিওশাকে যেন যত ভালো ভাবে সম্ভব আদর আপ্যায়ন করা হয়।

রাজা চলে যেতেই সভাসদরা সবাই মিলে আলিওশার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নানা রকম আদরে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, মন্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তারা সকলেই আলিওশার কোন না কোন উপকারে লাগার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল—কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল সে বাগানে বেড়াতে যেতে চায় কিনা কিংবা রাজার চিড়িয়াখানা দেখার ইচ্ছে তার আছে কিনা; কেউ বা তাকে শিকারে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। অবশেষে মন্ত্রী জানাল সে নিজেই প্রিয় অতিথিকে পাতালপুরীর সমস্ত পরমাশ্চর্য দেখাবে।

প্রথমে সে আলিওশাকে বাগানে নিয়ে গেল। বাগানের বীথিগুলো রঙবেরঙের বড় বড় নুড়িপাথরে ছাওয়া। গাছে গাছে ঝুলছে অসংখ্য ছোট ছোট বাতি। সেখান থেকে আলো এসে নুড়িগুলোর গায়ে লেগে ঠিকরে পড়ছে। এই আলোর ঝলকানি আলিওশার দারুণ ভালো লাগল।

মন্ত্রী বলল, 'এই পাথরগুলোকে তোমাদের ওখানে রত্ন বলা হয়ে থাকে। এ সবই হল হীরে, চুনি, পান্না আর নীলা।'

'আহা, আমাদের বাগানের ছোট ছোট পথগুলো যদি এই সব পাথরে ছাওয়া থাকত!' আলিওশা উৎফুল্ল হয়ে বলল।

'তাহলে আমাদের এখানকার মতো তোমাদের ওখানেও এদের আর তেমন কোন দাম থাকত না,' মন্ত্রী বলল।

গাছপালাও আলিওশার কাছে অসাধারণ সুন্দর বলে মনে হল, যদিও খুবই অদ্ভুত বটে। তাদের রঙের কী বাহার!—লাল, নীল, সবুজ, খয়েরি, সাদা, বেগনী! মনোযোগ দিয়ে লক্ষ

করার পর সে দেখতে পেল যে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের শেওলা ছাড়া আর কিছুই নয়, কেবল সাধারণ শেওলার চেয়ে লম্বা আর মোটা। মন্ত্রী তাকে বলল যে দূরে দূরে দেশ আর পৃথিবীর একেবারে তলা থেকে অনেক টাকা খরচ করে রাজা এই সমস্ত শেওলা আনিয়েছেন।

বাগান থেকে তারা গেল চিড়িয়াখানায়। সেখানে আলিওশাকে ওরা দেখাল সোনার শেকলে বাঁধা বন্য জন্তুজানোয়ার। বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার পর আলিওশা আশ্চর্য হয়ে গেল এই দেখে যে ঐ সমস্ত বন্য জন্তুজানোয়ার আসলে বড় বড় মেঠো ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর আর ছুঁচো জাতীয় জন্তু ছাড়া আর কিছু না। এরা মাটির নীচে, খেতখামারের তলায় থাকে। ব্যাপারটা তার কাছে বড়ই হাসির মনে হল, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সে একটি কথাও বলল না।

বেড়ানোর পর ওরা ঘরে ফিরে এলো। বড় ঘরে আলিওশা দেখতে পেল একটা বিরাট টেবিল, তার ওপর সাজানো রয়েছে নানা ধরনের মিষ্টি, পিঠে, বড়া আর ফলমূল। থালাগুলো সব খাঁটি সোনার, বোতল আর গেলাসগুলো এক‌েকটা পুরো হীরে, চুনি, পান্না কেটে তৈরি।

'যা মন চায় খাও,' মন্ত্রী বলল, 'কিন্তু সঙ্গে করে কিছু নিয়ে যেতে পারবে না।'

ঐদিন আলিওশা এর আগেই সন্ধেবেলা ভরপেট খেয়েছিল, তাই তার মোটে খিদে ছিল না।

সে বলল, 'তোমরা আমাকে শিকারে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছ।'

'বেশ,' মন্ত্রী বলল। 'আমার মনে হয় এতক্ষণে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো হয়ে গেছে।'

মন্ত্রী তক্ষুনি শিস দিল, সঙ্গে সঙ্গে সহিসরা এসে হাজির হল, তারা লাগাম ধরে সঙ্গে করে নিয়ে এলো কতকগুলো ছড়ি—ছড়ির হাতলে ঘোড়ার মাথা খোদাই করা! মন্ত্রী বেশ কায়দা করে তার নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসল। আলিওশাকে যে ছড়িটা দেওয়া হল সেটা অন্যদেরগুলোর তুলনায় অনেক বড়।

'সাবধান,' মন্ত্রী বলল, 'দেখবে ঘোড়া যেন পিঠ থেকে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে না দেয়—এটা মোটেই খুব একটা শান্তশিষ্ট ঘোড়া নয়।'

আলিওশা একথায় মনে মনে হাসল, কিন্তু যখন সে লাঠিটাকে দু'পায়ের মাঝখানে নিল তখন বুঝতে পারল মন্ত্রী অকারণে এই উপদেশ দেয় নি। লাঠি তার দু'পায়ের মাঝখানে পাক খেতে লাগল সত্যিকারের ঘোড়ার মতো, আলিওশাকে জিনের ওপর বসে থাকতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এর মধ্যে শিঙা বেজে উঠল, শিকারীরাও নানা সরু সরু অলিগলি আর সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অনেকক্ষণ তারা এই ভাবে ঘোড়া ছুটাল। আলিওশাও পিছিয়ে পড়ে রইল না, যদিও ক্ষ্যাপা লাঠিটা সামলাতে তার বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এমন সময় পাশের একটা সরু গলি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো কতকগুলো ধেড়ে ইঁদুর—এত বড় যে আলিওশা সে রকম কখনও দেখে নি। ইঁদুরগুলো পাশ কাটিয়ে ছুটে যাবার তাল করছিল, কিন্তু মন্ত্রী যখন তাদের ঘিরে ফেলতে বলল তখন তারা দাঁড়িয়ে পড়ে সাহসের সঙ্গে আত্মরক্ষা করতে লাগল। তা সত্ত্বেও শিকারীদের সাহসিকতা ও কৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত ওদের হার হল। আটটা ধেড়ে ইঁদুর ধরাশায়ী হল, তিনটি পিঠটান দিল। একটা গুরুতর আহত হয়েছিল—মন্ত্রী ওটাকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলে চিড়িয়াখানায় পাঠাতে আজ্ঞা দিল।

শিকারের পর আলিওশা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে তার চোখ আপনাআপনি বুজে আসছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কালোমানিকের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই সে যে বড় ঘর থেকে তারা শিকারে বেরিয়েছিল সেখানে ফিরে যাবার অনুমতি চাইল। মন্ত্রী তাতে আপত্তি করল না।

জোর কদমে তারা পিছনে ফিরে চলল। বড় ঘরে আসার পর তারা ঘোড়াগুলোকে সহিসদের হাতে ছেড়ে দিল, সভাসদ আর শিকারীদের নীচু হয়ে নমস্কার জানাল। তাদের জন্য চেয়ার আনা হল, তারা পাশাপাশি বসল।

আলিওশা শুরু করল, 'কিছু যদি মনে না কর ত জিজ্ঞেস করি বেচারি ইঁদুরগুলোকে তোমরা মারতে গেলে কেন? ওরা ত তোমাদের কিছু করে নি, তাছাড়া থাকেও তোমাদের বসবাসের জায়গা থেকে দূরে।'

মন্ত্রী বলল, 'আমরা যদি ওদের ধ্বংস না করতাম তাহলে ওরাই শিগগির আমাদের ঘরদোর থেকে আমাদের উৎখাত করত, আমাদের সমস্ত মজুদ খাবারদাবার খেয়ে শেষ করত। তাছাড়া ধেড়ে ইঁদুর আর মেঠো ইঁদুরদের লোমওয়ালা চামড়া আমাদের কাছে খুব দামী — হালকা আর নরম বলে। কেবল আমাদের বড় ঘরের লোকেরাই সে চামড়ার পোশাক পরতে পারে।'

'আচ্ছা, আমাকে বল দেখি, তোমরা কারা?' আলিওশা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কি কখনও শোন নি যে পাতালরাজ্যে আমাদের জাতির বাস?' মন্ত্রী বলল। 'এটা অবশ্য ঠিক যে আমাদের দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে, তবে এমনও দেখা গেছে, বিশেষত পুরাকালে, যে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে লোকজনকে দেখা দিয়েছি। কিন্তু এখন এটা কদাচিৎ ঘটে, কেন না লোকজন বড় দুর্বিনীত হয়ে পড়েছে। আমাদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে যার সামনে আমরা দেখা দিয়েছি সে লোক যদি ঘটনাটা গোপন না রাখে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাদের এখনকার থাকার জায়গা ছেড়ে অনেক অনেক দূরে, অন্য দেশে চলে যেতে হয়। তুমি সহজেই অনুমান করতে পারছ যে এখানকার সমস্ত রাজ্যপাট ছেড়ে প্রজাদের সকলকে নিয়ে অজানা কোন দেশে গিয়ে ওঠা আমাদের রাজার পক্ষে সুখের ব্যাপার নয়। তাই তোমার

কাছে একান্ত অনুরোধ যতদূর সম্ভব বুদ্ধিবিবেচনার পরিচয় দিও। আর তা যদি না কর তাহলে তুমি আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে, বিশেষত আমাকে। কৃতজ্ঞতাবশত আমি তোমাকে এখানে ডেকে আনার জন্যে রাজাকে অনুরোধ করি; কিন্তু তোমার অবিবেচনার জন্যে যদি এই দেশ আমাদের ছেড়ে দিতে হয় তাহলে উনি আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না...

'আমি তোমাকে সত্যি করে বলছি কখনও কারও কাছে তোমাদের কথা বলব না,' তাকে বাধা দিয়ে বলল আলিওশা। 'আমার এখন মনে পড়ল যে একটা বইয়ে পাতালপুরীর বামন ভূতদের কথা পড়েছিলাম। সেখানে লিখেছে যে কোন এক শহরে এক মুচি খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেজায় বড়লোক বনে যায়, কেউই বুঝতে পারে না কোথা থেকে সে এত ধনদৌলতের মালিক হল। শেষকালে কী ভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেল যে লোকটা পাতালের বামন ভূতদের জন্য জুতো সেলাই করত — এর জন্য তারা ওকে প্রচুর টাকাকড়ি দিত।'

'এটা সত্যি হলেও হতে পারে,' মন্ত্রী বলল।

'আচ্ছা তুমি আমাকে বল দেখি গো কালোমানিক, মন্ত্রী হয়েও কেন তুমি মুরগীর রূপ ধরে ওপরে এসে দেখা দাও আর ঐ ওলন্দাজ বুড়িদের সঙ্গেই বা তোমাদের সম্পর্ক কী?'

ওর কৌতূহল মেটানোর জন্য কালোমানিক ওকে সবিস্তারে অনেক কিছু বলবে ঠিক করেছে, কিন্তু তার বৃত্তান্তের শুরুতেই আলিওশার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল, সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। পর দিন সকালে জেগে উঠতে সে দেখতে পেল নিজের বিছানায় শুয়ে আছে।

অনেকক্ষণ সে ধাতস্থ হতে পারল না, ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না। কালোমানিক আর মন্ত্রী, রাজা আর বীরপুরুষেরা, ওলন্দাজ বুড়ি দু'জন আর ধেড়ে ইঁদুরের দল — সব তার মাথার মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, গতকাল রাতে যা যা দেখেছে অনেক চেষ্টায় সে-সমস্ত কিছু মনে মনে সাজিয়ে নিল আলিওশা। রাজা তাকে শণের বীচি দিয়েছিলেন মনে পড়তে সে তাড়াতাড়ি তার কোটটার দিকে ছুটে গেল, আর সত্যি সত্যিই কোটের পকেটে একটা কাগজ পেল, কাগজের মোড়কের মধ্যে শণের বীচিও ছিল। মনে মনে সে ভাবল, 'দেখা যাক রাজা তার কথা রাখে কিনা। কাল ক্লাস শুরু হবে, এখনও আমার সমস্ত পড়া তৈরি হয় নি।'

তার বিশেষ করে আশঙ্কা ছিল ইতিহাসের পড়া নিয়ে: বিশ্ব ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা তাকে মুখস্থ করতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা শব্দও সে জানে না!

সোমবার। ছাত্ররা সব ফিরে আসতে ক্লাসের পড়াশুনো শুরু হয়ে গেল। বোর্ডিং-ক্লাসের মালিক নিজে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ইতিহাসের ক্লাস নিলেন।

আলিওশার বুক ভীষণ দুরদুর করছিল। তার পালা আসার আগে থেকেই সে কয়েকবার পকেটের ভেতরে শণবীচির মোড়কটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। অবশেষে তার ডাক পড়ল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে মাস্টারমশাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল, কী বলতে হবে তার নিজেরই তখনও

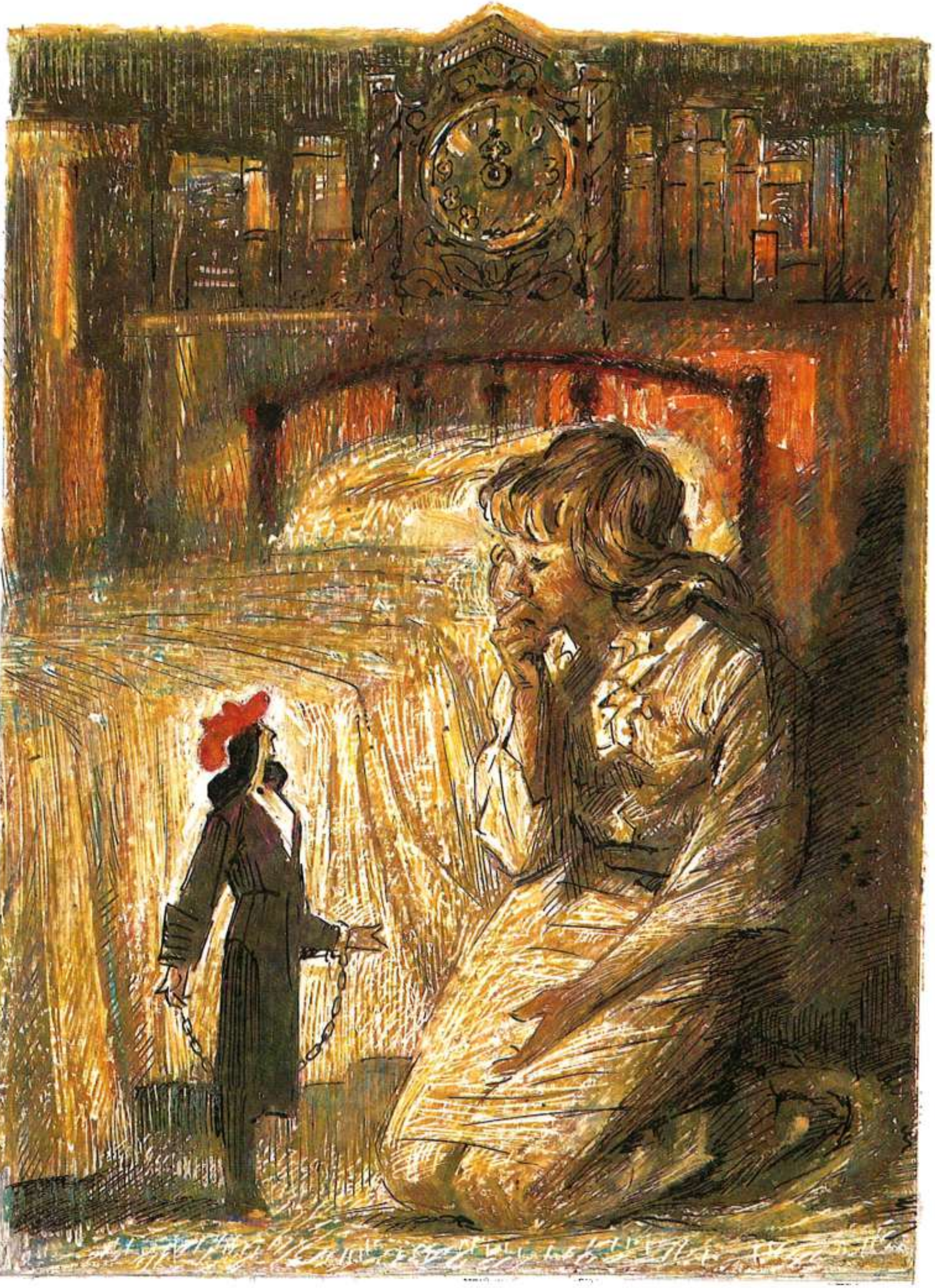

জানা নেই, কিন্তু সে মুখ খুলল, আর না থেমে গড়গড় করে নির্ভুল পড়া বলে গেল। মাস্টারমশাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এরকম ঘটনার বেলায় আলিওশার আগে যেমন অনুভূতি হত এবারে কিন্তু তেমন হল না, মাস্টারমশাইয়ের প্রশংসায় সে আগের মতো আনন্দ পেল না। তার ভেতর থেকে কে যেন বলছিল সে এই প্রশংসার যোগ্য নয়, কেননা এই পড়ার পেছনে তাকে কোন পরিশ্রম করতে হয় নি।

কয়েক সপ্তাহ ধরে মাস্টারমশাইয়ের মুখে আলিওশার প্রশংসা আর ধরে না। যে কোন পড়া তার নখদর্পণে, এতটুকু এদিক ওদিক নেই, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সে যা যা অনুবাদ করে তার কোনটাতে কোন ভুল নেই—মোটকথা, তার অসাধারণ সাফল্য দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এই সমস্ত প্রশংসায় আলিওশা ভেতরে ভেতরে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের সামনে তাকে আদর্শ হিশেবে রাখা হচ্ছে, অথচ সে তার যোগ্য নয়—এই ভেবে আলিওশার বিবেকে লাগত।

এই সময়ের মধ্যে কালোমানিক তার কাছে আর আসে নি, যদিও শণের বীচি পাবার পর, বিশেষ করে প্রথম কয়েক সপ্তাহ ত বটেই, এমন একটি দিনও যায় নি যখন বিছানায় শোবার সময় কালোমানিককে সে ডাকে নি। প্রথম প্রথম তার খুবই দুঃখ হত, কিন্তু পরে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে কালোমানিক হয়ত তার পদমর্যাদার উপযোগী কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছে। পরে তার ওপর ক্রমাগত প্রশংসার ধারা নেমে আসতে তাতে সে এতই মশগুল হয়ে পড়ল যে কালোমানিকের কথা তার প্রায় মনেই পড়ত না।

ইতিমধ্যে তার অসাধারণ দক্ষতা সম্পর্কে জনরব দেখতে দেখতে সারা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ছড়িয়ে পড়ল। খোদ স্কুল-ইনস্পেক্টর কয়েকবার বোর্ডিং-স্কুলে এসে আলিওশাকে তারিফ করে গেলেন। মাস্টারমশাই পারলে ওকে কোলে করে নিয়ে নাচেন, কেন না ওরই জন্য বোর্ডিং-স্কুল বিখ্যাত হয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত প্রান্ত থেকে মা-বাবারা এসে তাঁকে ধরে বসে যেন তিনি তাদের ছেলেদের দায়িত্ব নেন। তারা আশা করে যে তিনি দায়িত্ব নিলে তাদের ছেলেরাও আলিওশার মতো পণ্ডিত হবে।

দেখতে দেখতে স্কুল এমন ভরে উঠল যে আর নতুন ছাত্র নেবার মতো জায়গা থাকল না। মাস্টার আর মাস্টার-বৌ তখন এই বাড়িটার চেয়ে ঢের বড়সড় একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

আলিওশা, আগেই আমি বলেছি, আদৌ এই প্রশংসার যোগ্য নয় উপলব্ধি করে প্রথম প্রথম এর জন্য লজ্জা পেত। কিন্তু পরে অল্প অল্প করে এতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, আর শেষকালে তার অহঙ্কার এতদূরে পর্যন্ত গড়াল যে বিন্দুমাত্র লজ্জা না করে প্রশংসার ধারাবর্ষণ সে মেনে নিতে লাগল। নিজের সম্পর্কে সে বেশি করে ভাবতে লাগল, অন্য ছেলেদের সামনে ভারিক্কি চাল দেখাত, তার মনে মনে ধারণা হল যে ওদের সকলের চেয়ে সে অনেক ভালো, অনেক বেশি

বুদ্ধিমান। এর ফলে আলিওশার স্বভাবচরিত্র একেবারে নষ্ট হয়ে গেল — সুন্দর দরদী ও বিনয়ী ছেলেটা হয়ে গেল দাম্ভিক, অবাধ্য। তার বিবেক প্রায়ই এর জন্য তাকে তিরস্কার করত, ভেতর থেকে কে যেন তাকে বলত: 'আলিওশা অহঙ্কার করো না! তোমার যা নয় তা নিজের বলে মেনে নিতে যেয়ো না। ভাগ্যকে এই বলে ধন্যবাদ দাও যে তার দৌলতে অন্য শিশুদের চেয়ে তোমার কিছু সুবিধা আছে, কিন্তু তাই বলে এমন ভেবে বসো না যে তুমি তাদের চেয়ে ভালো। তুমি যদি নিজেকে শোধরাতে না পার তাহলে কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না, আর তাহলে তুমি যত বিদ্বানই হও না কেন চরম হতভাগ্য শিশু হবে!'

কখনও কখনও নিজেকে শোধরাবে বলে সে মনে মনে ঠিক করত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ভেতরে অহঙ্কার এত প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিল যে বিবেকের কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। দিনে দিনে সে খারাপ হতে থাকে, আর যতই দিন যায় বন্ধুবান্ধবরাও তাকে তত কম ভালোবাসতে থাকে।

শুধু তাই নয়, আলিওশা ভয়ানক দুরন্ত হয়ে উঠল। তাকে যে পড়া দেওয়া হত তা শেখার কোন গরজ না থাকাতে অন্য ছেলেরা যখন ক্লাসের পড়া তৈরি করত তখন সে দুরন্তপনা করে বেড়াত। এই কুঁড়েমির ফলে তার স্বভাবচরিত্র আরও খারাপ হয়ে গেল।

শেষকালে দুষ্ট স্বভাবের জন্য সকলে তার ওপর এত তিতবিরক্ত হয়ে গেল যে এমন দুষ্ট বালককে কী করে শোধরানো যায় তাই নিয়ে মাস্টারমশাই রীতিমতো ভাবিত হয়ে পড়লেন। এর জন্য তিনি অন্যদের যতটা পড়া দিতেন তার দ্বিগুণ তিনগুণ বেশি পড়া তাকে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র কাজ হল না। আলিওশা একেবারেই পড়াশুনো করত না, অথচ একফোঁটাও ভুল না করে আগাগোড়া পড়া বলতে তার আটকাত না।

একবার আলিওশাকে নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে মাস্টারমশাই তাকে পরদিন সকালের মধ্যে গোটা বিশেক পৃষ্ঠা পড়া মুখস্থ করতে দিলেন। তাঁর আশা ছিল অন্তত পক্ষে এই একটা দিন সে কিছুটা শান্ত থাকবে।

কিন্তু কিসের কী! আমাদের আলিওশা পড়ার ধারে কাছে গেল না! ঐ দিন সে ইচ্ছে করে অন্যান্য দিনের তুলনায় আরও বেশি দুরন্তপনা করল। মাস্টারমশাইও তাকে এই বলে জোর শাসালেন যে পরদিন সকালে পড়া বলতে না পারলে তার শাস্তি হবে। এই শাসানিতে আলিওশা মনে মনে হাসল। সে নিশ্চিত জানত যে শণের বীচিটা তাকে নির্ঘাত সাহায্য করবে।

পর দিন, যথাসময়, যে বই থেকে আলিওশাকে পড়া দেওয়া হয়েছিল সেটা হাতে নিয়ে মাস্টারমশাই তাকে কাছে ডাকলেন, পড়া বলতে বললেন। ক্লাসের সব ছেলেরা কৌতূহলভরে আলিওশার দিকে তাকাল। এদিকে আগের দিন আদৌ পড়া না করেও আলিওশা যখন বুক ফুলিয়ে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল তখন কাণ্ডকারখানা দেখে মাস্টারমশাইয়ের নিজেরই আক্কেল গুড়ুম। আলিওশার একটুকুও সন্দেহ ছিল না যে এবারেও

তার পক্ষে নিজের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে। সে হাঁ করল... কিন্তু একটা শব্দও মুখ দিয়ে বার করতে পারল না।

'কী হল? চুপ করে রইলে যে?' মাস্টারমশাই তাকে বললেন। 'পড়া বল।'

আলিওশা লজ্জায় লাল হয়ে গেল, তারপর তার মুখ ফেকাসে হল, ফের লাল হল লজ্জায়। সে হাত কচলাতে লাগল, আতঙ্কে তার চোখে জল এসে গেল। সব বৃথা! সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না, কেন না শণবীচির ওপর ভরসা করে সে বইয়ে চোখ অবধি বুলায় নি।

'এর মানে কী, আলিওশা?' মাস্টারমশাই গর্জন করে উঠলেন। 'কিছু বলছ না যে তুমি!'

আলিওশা নিজেই জানে না এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কী। বীচিটা হাতড়ে দেখার জন্য সে পকেটে হাত গলাল। কিন্তু বীচি খুঁজে না পাওয়ায় সে যে কী হতাশ হল তা বর্ণনা করা যায় না। তার চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল ঝরতে লাগল, সে ডুকরে কেঁদে উঠল, তবু একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।

মাস্টারমশাইয়ের ততক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। আলিওশা থতমত না খেয়ে সব সময় নির্ভুল উত্তর দিয়ে যাচ্ছে এই ঘটনায় এতদিন অভ্যস্ত হওয়ায় এখন মাস্টারমশাইয়ের মনে হচ্ছে আলিওশা যে অন্ততপক্ষে পড়ার গোড়ার দিকটাও জানে না এটা অসম্ভব। তাই আলিওশার নীরবতা তাঁর কাছে অবাধ্যতা বলে মনে হল।

'শোবার ঘরে চলে যাও,' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ পড়া সম্পূর্ণ মুখস্থ না হচ্ছে ততক্ষণ ওখানে থাকবে।'

আলিওশাকে নীচতলায় নিয়ে গিয়ে তার হাতে বই ধরিয়ে দিয়ে দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দেওয়া হল।

আলিওশা যখন দেখল যে সে একা, একমাত্র তখনই শণবীচিটার খোঁজে উঠে পড়ে লেগে গেল। সে অনেকক্ষণ নিজের পকেট হাতড়াল, মেঝের সর্বত্র হামাগুড়ি দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল, খাটের তলায় খুঁজল, কম্বল, বালিশ, চাদর উলটে পালটে দেখল— সবই বৃথা! সাধের সেই বীচিটির কোথাও কোন চিহ্নমাত্র নেই! সে মনে করার চেষ্টা করল কোথায় ওটা হারাতে পারে। শেষ কালে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হল আগের দিন উঠোনে খেলার সময় কোন রকমে পড়ে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু খুঁজে পাবার উপায়টা কী? সে এখন ঘরের মধ্যে বন্দী। তাছাড়া তাকে যদি উঠোনে বের হতে দেওয়া হত তাতেও কোন কাজ হত বলে মনে হয় না, কেন না তার জানা ছিল যে শণবীচির ওপর মুরগীদের বড় লোভ, তাই ওদের কেউ সম্ভবত ইতিমধ্যে ওটাকে খুঁটে

খেয়ে ফেলেছে! বীচি খুঁজে বার করার আশা ছেড়ে দিয়ে সে ঠিক করল সাহায্যের জন্য কালোমানিককে ডাকবে।

'ওরে আমার কালোমানিক!' আলিওশা বলল। 'মন্ত্রীমশাই গো! দয়া করে এসে আমাকে আরেকটা বীচি দিয়ে যাও! এর পর থেকে, সত্যি বলছি, আমি আরও সাবধান হব।'

কিন্তু কেউ তার অনুনয় বিনয়ের উত্তর দিল না। শেষে চেয়ারে বসে সে ফের কাঁদতে লেগে গেল।

ইতিমধ্যে দুপুরের খাবারের সময় হয়ে এলো; দরজা খুলে মাস্টারমশাই ঢুকলেন।

'এখন তোমার পড়া শেখা হয়েছে ত?' আলিওশাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আলিওশা সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, সে বলতে বাধ্য হল যে পড়া শেখে নি।

'তাহলে যতক্ষণ মুখস্থ না হচ্ছে ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে!' মাস্টারমশাই বললেন। আলিওশার জন্য এক গেলাস জল আর এক টুকরো যবের রুটি দিতে বলে তিনি ফের তাকে একা রেখে চলে গেলেন।

আলিওশা পড়া মুখস্থ করতে লাগল, কিন্তু তার মাথায় কিছুই ঢুকল না। বহুকাল হল পড়াশুনোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার নেই, তাছাড়া ছাপার বিশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করবেই বা কী করে! কত চেষ্টাই না সে করল, নিজের স্মৃতিশক্তিকে কতই না খাটাতে গেল, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসতে দেখা গেল দু-তিন পৃষ্ঠার বেশি তার মুখস্থ হয় নি, তাও আবার কোন রকম।

অন্য ছেলেদের যখন ঘুমানোর সময় হল তখন তার বন্ধুরা সকলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল শোবার ঘরে, তাদের সঙ্গে ফের এলেন মাস্টারমশাই।

'আলিওশা! পড়া মুখস্থ হয়েছে তোমার?' মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

বেচারি আলিওশা ছলছল চোখে উত্তর দিল, 'কেবল দুটো পৃষ্ঠা হয়েছে।'

'বটে, তাহলে কালও জলরুটি খেয়ে তোমাকে এখানে বসে থাকতে হচ্ছে,' এই বলে অন্য ছেলেদের শুভ রাত্রি কামনা করে মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

আলিওশা এখন তার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। যখন সে ভালো ছেলে ছিল, বিনয়ী ছিল তখন সকলে তাকে ভালোবাসত। তখন সে যদি শাস্তি পেত তাহলে সকলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করত, আর এটাই ছিল তার সান্ত্বনা। কিন্তু এখন কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না— সকলে তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল, কেউ তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

এক কালে যার সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল এমন একটি ছেলের সঙ্গে সে নিজে যেচে কথা বলতে গেল, কিন্তু সে ছেলেটাও কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আলিওশা আরও একজনের কাছে গেল, কিন্তু সেও তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল না, এমন কি আলিওশা ফের তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তখন হতভাগ্য আলিওশা বুঝতে পারল

যে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এমন ব্যবহারই তার প্রাপ্য। আলিওশা চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। এই ভাবে সে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল, শুয়ে শুয়ে অতীতের সুখী দিনগুলোর কথা মনে করে তার দুঃখ হতে লাগল। অন্য ছেলেরা ততক্ষণে মধুর নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে, একমাত্র সে-ই ঘুমোতে পারছে না। 'এমন কি কালোমানিকও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে,' আলিওশা মনে মনে ভাবল, আবার তার চোখ থেকে জল উপচে পড়ল।

এমন সময় পাশের খাটের চাদর নড়ে উঠল, যেমন হয়েছিল সেই প্রথম দিন, যখন কালো মুরগী তার সামনে হাজির হয়।

তার হৃৎপিন্ড আরও জোরে ওঠা পড়া করতে লাগল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল কালোমানিক যেন খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু ইচ্ছে যে পূর্ণ হবে এমন আশা সে বুক ঠুকে করতে পারছিল না।

'কালোমানিক, কালোমানিক!' শেষ কালে নীচু গলায় সে বলল।

চাদর সামান্য উঠে গেল, আলিওশার বিছানার ওপর উড়ে এসে বসল কালোমানিক।

'ওঃ, কালোমানিক!' আলিওশা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল। 'তোমার সঙ্গে যে দেখা হবে এমন আশা আমি বুক ঠুকে করতে পারছিলাম না! তুমি আমাকে ভুলে যাও নি ত?'

'না,' কালোমানিক বলল, 'তুমি আমার জন্যে যা করেছ তা আমি ভুলতে পারি না, যদিও যে আলিওশা আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তার সঙ্গে এখনকার এই আলিওশার কোন মিলই নেই। তুমি তখন ছিলে ভালো ছেলে, ছিলে বিনয়ী, ভদ্র; সবাই তোমাকে ভালোবাসত, কিন্তু এখন... আমি তোমাকে দেখে চিনতেই পারছি না!'

আলিওশা খুব কাঁদল, এদিকে কালোমানিক তাকে উপদেশ দিয়ে চলল। অনেকক্ষণ ধরে সে আলিওশার সঙ্গে কথা বলল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাকে অনুনয় করল শোধরানোর জন্য। শেষে যখন দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে তখন মুরগী তাকে বলল:

'এখন তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমার, আলিওশা! এই যে শণের বীচি, উঠোনে হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি। ওটা যে চিরকালের জন্যে খোয়া গেছে তোমার এই ভাবনা ঠিক নয়। আমাদের রাজা বড় উদার — তোমার অসাবধানতার জন্যে এই উপহার তোমার কাছ থেকে তিনি কেড়ে নিতে পারেন না। তবে একটা কথা মনে রেখো, তুমি হলফ করে বলেছ আমাদের সম্পর্কে যা জান সে সমস্ত গোপন রাখবে। তোমার এখনকার এই বদ স্বভাবের সঙ্গে আরও খারাপ একটা জিনিস — অকৃতজ্ঞতা যোগ করো না, আলিওশা!'

আলিওশা পরম পুলকিত হয়ে মুরগীর হাত থেকে তার মহামূল্যবান বীচিটা নিল, কথা দিল শোধরানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

'তুমি দেখো কালোমানিক আমার, আজ থেকে আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হব,' সে বলল।

'বদ অভ্যাস যখন একবার তোমাকে পেয়ে বসেছে তখন মনে করো না তা শোধরানো অত সহজ,' কালোমানিক বলল। 'বদ অভ্যাস সাধারণত দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ে, কিন্তু বেরোয় ছোট্ট ফাটল দিয়ে, তাই বলি কি নিজেকে শোধরানোর যদি ইচ্ছে থাকে তা হলে নিজের সম্পর্কে সব সময় কড়া হতে হবে। আচ্ছা চলি, আর নয়। এবারে যেতে হয়।'

মুরগী আলিওশাকে একা রেখে চলে যেতে আলিওশা তার শণবীচিটাকে বেশ করে দেখতে লাগল, দেখে দেখে তার আর আশ মেটে না। এখন পড়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, গতকালের দুঃখের চিহ্নমাত্র তার মনে রইল না! তার এই ভেবে আনন্দ হল যে সে যখন বিশ পৃষ্ঠা নির্ভুল মুখস্থ বলে যাবে তখন সকলে কী আশ্চর্যই না হবে! আর যারা তার সঙ্গে কথা বলতে চায় নি সেই বন্ধুদের ওপর সে যে আবার টেক্কা মারতে পারবে এই চিন্তা তার অহঙ্কারের পিঠ চাপড়ে দিল। নিজেকে শোধরানোর কথাটা সে ভুলে না গেলেও ভাবল কালোমানিক যেমন বলল আসলে ব্যাপারটা তত কঠিন নয়। 'নিজেকে শোধরানো যেন আমার ওপর নির্ভর করে না!' সে মনে মনে বলল। 'একবার ইচ্ছে করলেই হল, আবার সবাই আমাকে ভালোবাসবে।' কিন্তু হায়, বেচারি আলিওশা জানত না যে অহঙ্কার আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছাড়তে পারলে সেখান থেকেই না নিজেকে শোধরানোর শুরু!

সকালে ছেলেরা যখন ক্লাসে এসে জড়ো হল তখন আলিওশার ওপরে ডাক পড়ল। সে বেশ জাঁক করে হাসি হাসি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'তোমার পড়া তৈরি হয়েছে?' মাস্টারমশাই তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'হয়েছে,' আলিওশা বুক ফুলিয়ে বলল।

সে বলতে শুরু করল, গড়গড় করে আগাগোড়া বিশ পৃষ্ঠা মুখস্থ বলে গেল, কোথাও থামল না, বিন্দুমাত্র ভুল করল না। মাস্টারমশাইয়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না, আর আলিওশা গর্বভরে তাকাল তার বন্ধুদের দিকে।

আলিওশার হাবভাবে যে গর্ব ফুটে উঠছিল তা মাস্টারমশাইয়ের নজর এড়াল না।

'তোমার পড়া যে তৈরি হয়েছে এটা সত্যি,' তিনি বললেন, 'কিন্তু গতকাল কেন বলতে চাইলে না?'

'গতকাল আমার তৈরি ছিল না,' আলিওশা উত্তর দিল।

'হতেই পারে না,' মাস্টারমশাই ওকে বাধা দিয়ে বললেন। 'গতকাল সন্ধ্যায় তুমি বললে যে মোটে দুটো পৃষ্ঠা মুখস্থ হয়েছে, তাও ভালো করে নয়, আর এখন কিনা পুরো বিশ পৃষ্ঠা নির্ভুল বলে গেলে! কখন তুমি মুখস্থ করলে শুনি?'

আলিওশা চুপ করে রইল। শেষে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল:

'আজ সকালে মুখস্থ করেছি।'

কিন্তু ছেলেরা সকলে তার ঔদ্ধত্যে দারুণ আঘাত পেয়ে এবারে হঠাৎ সমস্বরে চিৎকার করে বলল, 'ও মিথ্যে কথা বলছে, আজ সকালে ও বই হাতেই নেয় নি!'

আলিওশা চমকে উঠল, মাটিতে চোখ নামিয়ে নিল, একটি কথাও বলল না।

'উত্তর দাও বলছি!' মাস্টারমশাই ছাড়লেন না। 'কখন পড়া মুখস্থ করলে?'

কিন্তু আলিওশা নীরবতা ভঙ্গ করল না। এই আচমকা প্রশ্নে আর তার প্রতি সমস্ত বন্ধুবান্ধবের এই বিদ্বেষ দেখে আলিওশা এত হকচকিয়ে গিয়েছিল যে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হতে পারছিল না।

এদিকে আগের দিন সে জেদের বশে পড়া বলতে চায় নি ধরে নিয়ে মাস্টারমশাই তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া কর্তব্য মনে করলেন।

আলিওশাকে তিনি বললেন, 'যত বেশি প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার অধিকারী তুমি হচ্ছ ততই বেশি করে বিনয়ী ও বাধ্য হওয়া উচিত তোমার। গতকালের গোঁয়ার্তুমির জন্যে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত, আর আজ তুমি নিজের অপরাধ আরও বাড়িয়েছ মিথ্যে বলে। ছাত্রবন্ধুরা, সবাই শোন!..' ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আলিওশা যতক্ষণ অবধি নিজেকে পুরোপুরি না শোধরাবে ততক্ষণ তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না — আমি বারণ করছি। আর এটা যেহেতু সম্ভবত ওর পক্ষে খুব একটা বড় শাস্তি নয় সেই হেতু আমি আজ্ঞা করছি বেত আনা হোক।'

বেত নিয়ে আসা হল। আলিওশা চোখেমুখে অন্ধকার দেখল। যতদিন ধরে এই বোর্ডিং-স্কুল আছে সেই সময়ের মধ্যে এই প্রথম বেত মেরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তাও আবার কাকে? না আলিওশাকে, যে নিজের সম্পর্কে বড় বেশি ভাবত, যার ধারণা ছিল সে সকলের চাইতে ভালো, সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান! কী লজ্জার কথা!

আলিওশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাস্টারমশাইয়ের দিকে ছুটে গেল, কথা দিল নিজেকে সম্পূর্ণ শোধরাবে।

'একথা আগে ভাবা উচিত ছিল,' মাস্টারমশাই বললেন।

আলিওশার চোখের জলে আর অনুশোচনায় তার বন্ধুদের করুণা হল। তারা ওকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। আলিওশা মনে মনে বুঝতে পারছিল যে সে ওদের সমবেদনা পাবার যোগ্য নয়, তাই তার আরও বেশি কান্না পেল।

'ঠিক আছে!' শেষকালে মাস্টারমশাই বললেন। 'তোমার বন্ধুদের অনুরোধে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম; কিন্তু একটা কথা — তোমাকে সকলের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করতে হবে, বলতে হবে কখন তুমি তোমার পড়া মুখস্থ করলে।'

আলিওশার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেল। পাতালপুরীর রাজা আর তার মন্ত্রীকে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ভুলে গিয়ে কালো মুরগী, বীরপুরুষ আর খুদে লোকদের কথা বলতে শুরু করল।

মাস্টারমশাই ওর কথা শেষ করতে দিলেন না।

'কী!' তিনি রাগে গর্জন করে উঠলেন। 'দুর্ব্যবহারের জন্যে কোথায় অনুতাপ তা নয়, কোথাকার কোন্ কালো মুরগীর গপ্পো বানিয়ে কিনা আমাকে ধাপ্পা মারার মতলব? এটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। না, ছেলেরা, তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ ওকে সাজা না দিয়ে পারা যায় না।'

বেচারি আলিওশাকে মাস্টারমশাই বেত মারলেন।

আলিওশা মাথা নীচু করে চলে গেল নীচ তলায়, শোবার ঘরে। তার তখন মরে যাবার মতো অবস্থা। লজ্জায় আর অনুতাপে তার মন ভার হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা বাদে খানিকটা শান্ত হয়ে আসার পর যখন সে পকেটে হাত দিল শণবীচিটা আর সেখানে পেল না। শণবীচিটা এবারে চিরকালের জন্যে খোয়া গেছে বুঝতে পেরে আলিওশা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলায় অন্য ছেলেরা ঘুমোতে এলে সেও বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। খারাপ আচরণের জন্য তার কী অনুশোচনাই না হচ্ছিল! সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল নিজেকে শোধরাবে, যদিও বুঝতে পারছিল যে শণবীচিটা ফিরে পাবার কোন উপায় নেই।

মাঝরাতের দিকে ফের পাশের খাটের চাদর নড়েচড়ে উঠল। এর আগের রাতে আলিওশা এতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন সে চোখ বুজে ফেলল। কালোমানিককে দেখতে পাবে ভেবে তার ভয় হচ্ছিল। বিবেকের যাতনায় সে কষ্ট পাচ্ছিল। মাত্র গতকালও সে এত জোর দিয়ে কালোমানিককে বলেছিল যে নিজেকে অবশ্যই শোধরাবে, কিন্তু তার বদলে কিনা... কী সে এখন বলবে ওকে?

কিছুক্ষণ সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। চাদর ওঠার খসখস আওয়াজ তার কানে এলো। কে যেন তার খাটের কাছে এগিয়ে এলো। পরিচিত, খুবই পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর তাকে ডাকল নাম ধরে:

'আলিওশা, আলিওশা!'

কিন্তু আলিওশার চোখ খুলতে লজ্জা হচ্ছিল, এদিকে চোখ থেকে দরদর ধারে তার দু'গাল বয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এমন সময় কে যেন গায়ের কম্বল ধরে টান দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলিওশাকে চোখ মেলে তাকাতে হল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কালোমানিক — মুরগীর চেহারা নিয়ে নয়, তার পরনে

কালো আঙরাখা, মাথায় খাঁজ-খাঁজ কাটা টকটকে লাল টুপি, গলায় কড়মড়ে কলপ-দেয়া সাদা রুমাল — যেমন আলিওশা তাকে দেখেছিল পাতালপুরীর বড় ঘরে।

মন্ত্রী বলল, 'আলিওশা, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি ঘুমোচ্ছ না।... বিদায়! আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি, আমাদের আর দেখা হবে না!'

আলিওশা ডুকরে কেঁদে উঠল।

'বিদায়!' আলিওশা বলল। 'বিদায়! পারলে আমাকে ক্ষমা করো! আমি জানি যে তোমার কাছে আমি অপরাধী।'

'আলিওশা!' মন্ত্রী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল। 'আমি তোমাকে ক্ষমা করছি; তুমি যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ সে কথা আমি ভুলতে পারি না। যদিও তুমি আমাকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছ, হয়ত বা সারা জীবনের জন্যেই, তবু আমি তোমাকে ভালোবাসি। বিদায়! আমি খুব কম সময়ের জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছি। আজ রাতের মধ্যেই রাজাকে তাঁর সমস্ত লোকজন নিয়ে এই রাজ্য ছেড়ে দূরে, অনেক দূরে চলে যেতে হবে। সবাই ভেঙে পড়েছে, সবাই অঝোরে চোখের জল ফেলছে। আমরা কয়েক শ' বছর ধরে এখানে বাস করছিলাম এত সুখে, এত শান্তিতে!'

আলিওশা দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্ত্রীর ছোট ছোট হাতে চুমু খেতে গেল। তার হাত খপ্ করে চেপে ধরার পর আলিওশা দেখতে পেল হাতের ওপর কী যেন চকচক করছে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কেমন একটা শব্দও তার কানে এসে বাজল।

'এটা কী?' আলিওশা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মন্ত্রী দু'হাত উঁচু করে তুলে ধরতে আলিওশা দেখতে পেল তাতে সোনার শেকল আর কড়া লাগানো। আলিওশা আঁতকে উঠল।

'তোমার অভদ্র ব্যবহারের ফলেই আমার এই শাস্তি — আমাকে এই শেকল বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বলল, 'কিন্তু কেঁদো না আলিওশা! তোমার চোখের জলে আমার কোন সাহায্য হবে না। আমার এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে একমাত্র তুমিই একটা ব্যাপারে আমাকে সান্ত্বনার কারণ হতে পার: নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করো, আগের মতো আবার ভালো ছেলে হও। শেষ বারের মতো বিদায় জানাচ্ছি।'

মন্ত্রী আলিওশার করমর্দন করে পাশের খাটের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কালোমানিক! কালোমানিক!' পেছন পেছন আলিওশা তাকে চেঁচিয়ে ডাকল, কিন্তু কালোমানিক সাড়া দিল না।

সারা রাত আলিওশা এক ফোঁটা চোখ বুজতে পারল না। ভোরের আলো ফোটার এক ঘণ্টা আগে তার মনে হল মেঝের তলায় কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে মেঝেয় কান পাতল, অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেল ছোট ছোট চাকার খটখট শব্দ আর নীচে

অসংখ্য ছোট ছোট লোকজনের হাঁটাচলার আওয়াজ। এই সব আওয়াজের মাঝখানে শোনা যাচ্ছিল নারী আর শিশুদের কান্না, মন্ত্রী কালোমানিকের কণ্ঠস্বর। কালোমানিক চেঁচিয়ে বলছে তাকে:

'আলিওশা, আলিওশা! বিদায়! চিরকালের জন্যে বিদায়!'

পরদিন সকালে ছেলেরা জেগে উঠে দেখতে পেল আলিওশা অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। সকলে তাকে ধরাধরি করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল, ডাক্তার ডেকে পাঠাল। ডাক্তার এসে জানালেন যে আলিওশার দারুণ জ্বরবিকার হয়েছে।

সপ্তাহ ছয়েক বাদে আলিওশা সুস্থ হয়ে উঠল। অসুখের আগে যে সমস্ত ঘটনা তার ভাগ্যে ঘটেছিল সে সমস্তই এখন তার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। না মাস্টারমশাই, না বন্ধুবান্ধব — কেউই তাকে কালো মুরগী সম্পর্কে একটি কথাও বলল না, সে যে সাজা পেয়েছিল সেই সম্পর্কেও নয়। এদিকে আলিওশার নিজেরই লজ্জা হতে লাগল সে কথার উল্লেখ করতে। সে চেষ্টা করল কথার বাধ্য হতে, ভালো হতে, বিনয়ী আর অধ্যবসায়ী হতে। সে আবার সকলের স্নেহ ভালোবাসা ফিরে পেল। সে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে আদর্শ হল, যদিও ছাপার বিশ পৃষ্ঠা এখন আর সে মুখস্থ করতে পারে না। তবে ওরকম পড়া তাকে দেওয়াও হয় না।

ভ্লাদিমির অদয়েভস্কি

নস্যিদানির পুরী

বাবা টেবিলের ওপর নস্যিদানি রাখলেন।

'এদিকে আয় দেখি মিশা, দেখে যা,' তিনি বললেন।

মিশা কথার বাধ্য। সে সঙ্গে সঙ্গে খেলনাপাতি রেখে বাবার কাছে এগিয়ে এলো। হ্যাঁ, দেখার মতো জিনিস বটে! কী সুন্দর নস্যিদানি! কাছিমের খোলের তৈরি, কী তার বাহার! আর ঢাকনার ওপরটা! কী সব আঁকা আছে তাতে! তোরণ, মিনার, একটা ছোট বাড়ি, ঐ রকম আরেকটা, আরও একটা এবং আরও একটা — কত যে তা গুণে শেষ করা যায় না — সব খুদে, যত খুদে হতে পারে, সব সোনার; গাছপালাও সোনার, কিন্তু সেগুলোর পাতা রুপোর।

গাছপালার পেছনে উঠছে সূর্য্যি। তার গোলাপি কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে সারা আকাশে।

'এটা কী শহর?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'এ হল ঢং-ঢং পুরী,' বলে বাবা একটা স্প্রিং ছুঁলেন।

তারপর? হঠাৎই অদৃশ্য কোথায় যেন বেজে উঠল বাজনা। এই বাজনা যে কোথা থেকে আসছে মিশা বুঝতে পারল না। সে দরজার দিকেও এগিয়ে গেল — ভাবল, অন্য ঘরটা থেকে আসছে না ত? গেল বড় ঘড়ির দিকে — ঘড়ির ভেতরে নাকি? বাবার কাজের টেবিল, বাসন রাখার আলমারি — কোথাও বাদ দিল না — একবার এখানে আরেকবার ওখানে কান পেতে শোনে; টেবিলের নীচটাও দেখল। শেষকালে মিশা নিশ্চিত বুঝতে পারল যে বাজনা বাজছে নস্যিদানির ভেতরে। সে নস্যিদানির দিকে এগিয়ে এলো। তাকিয়ে দেখল গাছের আড়াল থেকে সূর্য্যি উঠে আসছে, আস্তে আস্তে আকাশের ওপর দিয়ে গুড়ি মেরে চলেছে, আকাশ আর শহর ক্রমেই আলোয় আলোময় হয়ে উঠছে; জ্বলজ্বলে আলোয় জানলাগুলো ঝলমল করছে আর মিনারগুলো থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে আলোর আভা। দেখতে দেখতে সূর্য্যি আকাশের মাথায় উঠে গিয়ে অন্য দিক ধরে নামতে থাকল নীচে, আরও নীচে; শেষকালে ছোট্ট টিলাটার ওপাশে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, শহরের বুকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, জানলার খড়খড়ি বন্ধ হল, মিনারগুলো আবছা হয়ে এলো। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। একটা একটা করে তারা জ্বলে উঠল, গাছপালার আড়াল থেকে এক ফালি চাঁদও উঁকি মারল — শহর আবার বেশ আলো ঝলমলে হয়ে উঠল, জানলাগুলো রুপোলি আলোয় চকচক করতে লাগল, মিনারগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়ল নীলচে আলোর আভা।

'বাবা! বাবা! এই ছোট শহরটাতে ঢোকা যায় না? ওঃ কী ইচ্ছেই না করছে আমার!'

'সে হয় না রে। এই শহরটা তোর মাপের নয়।'

'ওতে কিছু হবে না, বাবা। আমি খুব ছোট। আমাকে একটিবার ওখানে ছেড়েই দেখ না। ওখানে কী হচ্ছে বড় ইচ্ছে হয় আমার জানতে।'

'যা বলেছিস, তোকে ছাড়াই ওখানে জায়গায় কুলোয় না।'

'কিন্তু ওখানে থাকে কারা?'

'ওখানে কারা থাকে? ওখানে থাকে ছোট ছোট ঘণ্টি।' এই বলে বাবা নস্যিদানির ঢাকনা তুললেন। আর মিশা কী দেখতে পেল? দেখতে পেল ছোট ঘণ্টি, হাতুড়ি, চাকা আর একটা চোঙ। মিশা অবাক হয়ে গেল।

'এই ঘণ্টিগুলো কেন? কেন এই হাতুড়িগুলো? কেনই বা এই আঙটা লাগানো চোঙটা?' মিশা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল।

বাবা উত্তর দিলেন, 'সে তোকে বলব না, মিশা। নিজেই ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ, চিন্তা করে

দ্যাখ, হয়ত আন্দাজ করতে পারবি। তবে হ্যাঁ স্প্রিংয়ে হাত দিবি না, তাহলে কিন্তু সব ভেঙেচুরে যাবে।'

বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিশা নস্যিদানি নিয়ে পড়ে রইল। ওটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল, ভালো করে তাকিয়ে দেখল, তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই ভাবতে লাগল ঘণ্টিগুলো বাজছে কী করে?

বাজনা কিন্তু বাজছে ত বাজছেই। দেখতে দেখতে আওয়াজ মৃদু, আরও মৃদু হয়ে আসতে লাগল, মনে হল পায়ে পায়ে কী যেন আঁকড়ে ধরছে, যেন কিসের ধাক্কায় একটা আওয়াজ আরেকটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মিশা শেষ কালে দেখতে পেল নস্যিদানির তলায় একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেল, খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো একটা ছেলে — তার মাথাটা সোনার, পরনে তার লোহার ঘাগরা। ছেলেটা দরজার চৌকাঠের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিশাকে ইশারায় ডাকল।

'এ কী ব্যাপার? বাবা যে বললেন এই শহরটাতে আমাকে ছাড়াই জায়গায় কুলোয় না!' মিশা মনে মনে ভাবল। 'না, দেখা যাচ্ছে ওখানে ভালো মানুষেরা থাকে। দেখছ না, আমাকে ওরা নিমন্ত্রণ করছে!'

'যদি বলেন ত অবশ্যই যাব। খুবই খুশি মনে যাব!'

মিশা দৌড়ে গেল দরজাটার দিকে, আশ্চর্য হয়ে দেখলে যে দরজাটা হুবহু তার মাপের। ভদ্র ছেলের মতন সে বিবেচনা করে দেখল তাকে যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে আগে দুটো কথা বলা কর্তব্য।

'দয়া করে বলুন, কার সঙ্গে আমি কথা বলে ধন্য হচ্ছি?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'ঢং-ঢং-ঢং,' অপরিচিত লোকটা উত্তর দিল। 'আমি ঘণ্টি-খোকা, এই পুরীতে থাকি। আমরা শুনেছি যে আমাদের এখানে বেড়াতে আসা আপনার বড় ইচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি আমাদের এখানে আপনাকে স্বাগত জানিয়ে আমরা কৃতার্থ হব। ঢং-ঢং-ঢং, ঢং-ঢং-ঢং!'

মিশা বিনীতভাবে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল। ঘণ্টি-খোকা তার হাত ধরল, ওরা দু'জনে চলল। তখন মিশা লক্ষ করল তাদের মাথার ওপরে ফুলো ফুলো বাহারী কাগজের খিলান, ধারগুলো সোনালি। তাদের সামনে ছিল আরেকটা খিলান, তবে একটু ছোট, তারপর আরেকটা — আরও একটু ছোট, আরেকটা — তার চেয়েও ছোট — এই ভাবে চলেছে একের পর এক — যত দূরে তত ছোট; যেতে যেতে দেখা গেল শেষেরটা এত ছোট যে তার সঙ্গীর মাথা সেখান দিয়ে কোন রকমে গলতে পারে না।

মিশা তখন তার সঙ্গীকে বলল, 'আপনাদের নিমন্ত্রণের জন্য আমি আপনাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই নিমন্ত্রণের সুযোগ আমি নিতে পারব কিনা জানি না। এখান দিয়ে আমি অনায়াসে গলে যেতে পারব ঠিকই, কিন্তু এর পরে, চেয়েই দেখুন না, কী নীচু নীচু খিলান চলে

গেছে আপনাদের; যদি অনুমতি করেন ত খোলাখুলিই বলি, ওখানে হামা দিয়েও বেরোনো আমার সাধ্যি নয়। আপনিই বা কেমন করে যেতে পারেন ভেবে আমি অবাক হচ্ছি।'

'ঢং-ঢং-ঢং!' ছেলেটি তার কথার উত্তরে বলল। 'চলে আসুন, ঘাবড়াবেন না, আমার পেছন পেছন আসুনই না।'

মিশা তার কথামতো কাজ করল। আর সত্যি কথা বলতে গেলে কি তাদের প্রতি পদক্ষেপে খিলানগুলো যেন ওপরে উঠতে লাগল, ওরা দু'জনে কোথাও কোন বাধা পেল না। শেষ খিলানটার কাছে পে'ছিতে ঘণ্টি-খোকা মিশাকে পিছু ফিরে তাকাতে বলল। মিশা পিছু ফিরে তাকাল — তাকিয়ে কী সে দেখতে পেল? ছোট দরজাটার ভেতরে ঢোকার পর প্রথম যে খিলানটার নীচে সে এসেছিল এখন সেটা তার কাছে মনে হল খুবই ছোট — যেন তারা যতক্ষণ চলছিল সেই সময়ের মধ্যে খিলান নীচে নেমে গেছে। মিশা ভারী আশ্চর্য হল।

'কী করে এমন হল?' সে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল।

'ঢং-ঢং-ঢং!' সঙ্গী ছেলেটি জবাব দিল। 'দূরে থেকে সব সময়ই এরকম মনে হয়। দেখা যাচ্ছে আপনি দূরের কোন জিনিস কখনও মন দিয়ে লক্ষ করে দেখেন নি। দূরে থেকে সব জিনিস ছোট মনে হয়, কাছে এলেই বড় দেখা যায়।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিকই,' মিশা উত্তর দিল। 'এর আগে আমি কথাটা ভেবে দেখি নি, ভাবি নি বলেই আমার কী দশা হয়েছিল বলি: গত পরশুর আগের দিন যখন মা আমার পাশে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন, আর বাবা ঘরের আরেক কোনায় বসে বই পড়ছিলেন তখন আমি ও'দের আঁকার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই কোন সুবিধে করে উঠতে পারছিলাম না — কত খাটাখাটুনিই না করলাম, যতদূর পারা যায় যত্ন করে আঁকলাম, কিন্তু আমার কাগজে যা আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাবা বসে আছেন মা'র পাশে আর বাবার আরামকেদারাটা পিয়ানোর পাশে, অথচ আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি যে পিয়ানোটা আছে আমার পাশে জানলার ধারে, আর বাবা বসে আছেন ঘরের অন্য কোনায়, ফায়ার প্লেসের ধারে। মা আমাকে বললেন, বাবাকে ছোট করে আঁকা দরকার, কিন্তু আমি ভাবলাম মামণি বুঝি ঠাট্টা করছেন, কেন না বাবা ত তাঁর চেয়ে লম্বায় অনেক বড়! কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে মামণি ঠিকই বলেছিলেন। বাবাকে ছোট করে আঁকা উচিত ছিল, কেন না উনি বসে ছিলেন দূরে। এই কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ, খুবই কৃতজ্ঞ।'

ঘণ্টি-খোকা প্রাণপণ শক্তিতে হেসে উঠল: 'ঢং-ঢং-ঢং, কী হাসির কথা! ঢং-ঢং-ঢং, কী হাসির কথা! বাবাকে আর মাকে একসঙ্গে আঁকতেই পারলেন না! ঢং-ঢং-ঢং, ঢং-ঢং-ঢং!'

ছেলেটা যে এমন নির্দয়ভাবে তাকে নিয়ে হাসছে এতে মিশার বিছছিরি লাগল। সে তখন খুব বিনীত ভাবে তাকে বলল:

'আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন ত জিজ্ঞেস করি কথায় কথায় আপনি কেন অমন ঢং-ঢং করেন?'

'ওটা আমাদের একটা লব্‌জ আর কি,' ঘণ্টি-খোকা উত্তর দিল।

'লব্‌জ?' মিশা মন্তব্য করল। 'কিন্তু আমার বাবা যে বলেন ওসব লব্‌জ-টব্‌জ অভ্যেস করা ভালো না।'

ঘণ্টি-খোকা ঠোঁট কামড়াল, আর একটি কথাও সে বলল না।

তাদের সামনে আরও ছোট ছোট দরজা; সেগুলো খুলে গেল, মিশা রাস্তায় এসে পড়ল। এ আবার কী রাস্তা! কী শহর এটা! সদর রাস্তা একটা বড় ঝিনুকে বাঁধানো; আকাশ বিচিত্র বর্ণের, কচ্ছপের খোল; আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সোনালি সূর্যি; তাকে ইশারায় ডাকলেই হল — আকাশ থেকে নেমে এসে তোমার হাত জড়িয়ে পাক খেয়ে ফের আকাশে উঠে যাবে। আর বাড়িগুলো সব লোহার, চকচকে পালিশ করা, রঙবেরঙের শামুক-ঝিনুকের খোলে ছাওয়া, আর প্রতিটি ছাদের নীচে বসে আছে একটি করে ঘণ্টি-খোকা — তাদের সবারই মাথা সোনার, পরনে রুপোর ঘাগরা। সংখ্যায় তারা অসংখ্য, অজস্র, আর একজন আরেকজনের চেয়ে ছোট, আরও ছোট।

'না, এবারে আর কেউ আমাকে ঠকাতে পারছে না,' মিশা বলল, 'কেবল দূর থেকেই এরকম মনে হচ্ছে, আসলে ত ঘণ্টি-খোকারা সকলে আকারে এক।'

'না, এখানেই ভুল করলে,' সঙ্গী বলল, 'ঘণ্টিরা সবাই এক আকারের নয়। আমরা সবাই যদি আকারে এক হতাম তা হলে বাজতামও সবাই এক সুরে — একে আরেকের মতন; কিন্তু তুমি শুনতে পাচ্ছ আমরা কী রকম গান বার করি? তার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে যে একটু বড় তার গলাও একটু মোটা। এটাও তুমি জান না? তাহলে দেখতে পাচ্ছ মিশা, একটা শিক্ষা তোমার হল: যাদের মুদ্রাদোষ আছে আগে থাকতেই তাদের নিয়ে হাসাহাসি করো না। যার কথার লব্‌জ আছে এমন লোকও কখনও কখনও অন্যদের চেয়ে বেশি জানতে পারে, তার কাছ থেকেও কিছু শেখার থাকতে পারে।'

এবারে মিশাকে জিভ কামড়াতে হল।

এর মধ্যে দেখতে দেখতে ঘণ্টি-খোকারা এসে তাদের ঘিরে ধরেছে, তারা মিশার পোশাক ধরে টানাটানি করতে লাগল, টুংটাং বাজতে লাগল, লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল।

'বেশ ফুর্তিতে আছ তোমরা,' মিশা ওদের বলল। 'তোমাদের সঙ্গে চিরকালের জন্যে থেকে গেলে বেশ হত। সারাদিন তোমাদের কিছুই করার নেই। তোমাদের না আছে পড়াশুনো, না মাস্টারমশাই, তার ওপর সারা দিন চলছে গানবাজনা।'

'ঢং-ঢং-ঢং!' ঘণ্টিরা চেঁচিয়ে বলল। 'তোমার বুঝি মনে হয় আমরা বেশ ফুর্তিতে আছি! না মিশা, আমাদের অবস্থা শোচনীয়। এটা ঠিক যে পড়াশুনোর বালাই আমাদের নেই, কিন্তু তাতে লাভটা কী? পড়াশুনোকে আমরা ভয় করতাম না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের কোন কাজকর্ম নেই — এমনই হতভাগ্য আমরা! আমাদের বইপত্তর নেই, ছবি-টবি কিছু নেই, মা-বাবাও নেই; করার মতো কোন কাজ নেই। সারা দিন কেবল খেলা আর খেলা, এটা কিন্তু একঘেয়ে, বড়ই

একঘেয়ে, মিশা। বিশ্বাস করবে কি? আমাদের কচ্ছপ খোলের আকাশ সুন্দর, সোনালি সূর্যি আর সোনালি গাছপালা — তাও সুন্দর; কিন্তু এসব আমরা ঢের দেখলাম, দেখে দেখে বেজায় বিরক্তি ধরে গেছে। এই পুরী থেকে আমরা এক বিঘতও বাইরে যেতে পারি না, আর তুমি নিজেই ধারণা করতে পার চিরটা কাল কিছুই না করে নস্যিদানির ভেতরে বসে থাকাটা কী সাংঘাতিক!— এমনকি সে নস্যিদানিতে যদি বাজনা বাজে তা-ও।'

'হ্যাঁ,' মিশা স্বীকার করল, 'তোমরা ঠিকই বলছ। আমারও অনেক সময় এরকম হয় — পড়াশুনো তৈরি হয়ে যাবার পর যখন খেলনা নিয়ে খেলতে শুরু করি তখন বেশ ফুর্তি লাগে; কিন্তু ছুটিছাটার দিনে যখন সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা তখন সন্ধে হতে না হতেই একঘেয়েমি ধরে যায়; এ খেলনা ও খেলনা যেটাই ধর না কেন কোনটাতে আর মজা লাগে না। আমি এত দিন বুঝতে পারি নি এমনটা কেন হয়, এবারে বুঝতে পারলাম।'

'হ্যাঁ, তার ওপরে আবার আমাদের আরেকটা দুশ্চিন্তার কারণ আছে মিশা, সে হল গিয়ে আমাদের খুড়োরা।'

'খুড়োরা কী রকম?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'হাতুড়ি-খুড়োরা,' ঘণ্টিরা বলল। 'এইসা পাজি না! পই পই করে পুরীতে ঘুরঘুর করে বেড়ায় আর আমাদের ঘা মারে। আমাদের মধ্যে যারা একটু বড় তাদের ওপর ঠুকঠাক খানিকটা কম হয়, কিন্তু ছোটদের ওপর জবর চোট পড়ে।'

আর সত্যি সত্যিই মিশা দেখতে পেল রাস্তায় সরু সরু ঠ্যাঙওয়ালা লম্বা নাকের, বাবু চেহারার কারা যেন ঘোরাঘুরি করছে। তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে: 'ঠুক-ঠুক-ঠুক! ঠুক-ঠুক-ঠুক! ওঠা রে ওঠা! লাগা রে লাগা! ঠুক-ঠুক-ঠুক! ঠুক-ঠুক-ঠুক!'

সত্যিই কিন্তু হাতুড়ি-খুড়োরা অবিরাম কখনও এ ঘণ্টির কখনও ও ঘণ্টির গায়ে ঠুকঠাক ঘা মেরে চলেছে। বেচারি মিশার পর্যন্ত এ দৃশ্য দেখে ওদের জন্য দুঃখ হতে লাগল। সে ঐ বাবুদের দিকে এগিয়ে গিয়ে খুব ভদ্র ভাবে তাদের নমস্কার জানাল, বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল কেন ওরা বেচারি ছেলেদের অমন নিষ্ঠুর প্রহার করছে। হাতুড়িরা উত্তর দিল:

'ভাগ এখান থেকে, গোলমাল করো না! ওখানে প্রাসাদ-কুঠুরীতে আলখাল্লা পরে শুয়ে আছেন আমাদের পরিদর্শক — উনিই আমাদের আদেশ দিয়েছেন ঘা মারার। অনবরত এপাশ ওপাশ করছেন আর আঁকড়ে ধরছেন। ঠুক-ঠুক-ঠুক! ঠুক-ঠুক-ঠুক!'

'কে তোমাদের পরিদর্শক?' মিশা জিজ্ঞেস করল ঘণ্টিদের।

'চুঙ্গি মশাই,' তারা টুং টাং করে সমস্বরে বলল, 'বড় ভালো লোক, দিনরাত গদিতে শুয়ে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নেই।'

মিশা সটান চলে গেল পরিদর্শক মশাইয়ের কাছে। দেখতে পেল সত্যি সত্যিই লোকটা একটা আলখাল্লা পরে গদির ওপর শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে, কিন্তু সব সময়ই মুখ ঊর্ধ্বপানে তুলে।

আর তার আলখাল্লার ওপর গাঁথা আছে রাজ্যের যত কাঁটা আর আঁকশি। কোন হাতুড়ি তার সামনে পড়ল কি অমনি সে প্রথম তাকে আঁকশি দিয়ে আটকে ধরে, তারপর ছেড়ে দেয়, আর হাতুড়িও সঙ্গে সঙ্গে ঘা মারে ঘণ্টির গায়ে।

মিশা এগিয়ে আসতেই পরিদর্শক হাঁক পাড়ল, 'লাগ ভেল্‌কি লাগ! কে যায়? কে ঘুর ঘুর করে এখানে? লাগ ভেল্‌কি লাগ! সরছে না যে, কে ওটা? কে আমার ঘুমের ব্যাঘাত করছে? লাগ ভেল্‌কি লাগ, লাগ ভেল্‌কি লাগ!'

'আমি,' বুক ফুলিয়ে জবাব দিল মিশা, 'আমি মিশা।'

'কী চাই তোমার?' পরিদর্শক জিজ্ঞেস করল।

'এই বেচারি ঘণ্টি-খোকাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। হাজার হোক ওরা এত বুদ্ধিমান, এত ভালো, এত সুন্দর বাজিয়ে, কিন্তু আপনার হুকুমে খুড়োরা কিনা ওদের সমানে ঘা মেরে চলছে।'

'তাতে আমার কী করার আছে? লাগ ভেল্‌কি লাগ! আমি ত আর এখানকার ওপরওয়ালা নই। খুড়োরা ঘা মারলে মারুক ছেলেদের! আমার তাতে কী? আমি পরিদর্শক, কারও সাতে পাঁচে নেই, গদির ওপর শুয়ে থাকি, কারও ওপর নজর-টজর রাখি না। লাগ ভেল্‌কি লাগ, লাগ ভেল্‌কি লাগ...'

'হুঁ এই শহরে আমি অনেক কিছু শিখলাম!' মনে মনে বলল মিশা। 'এই যেমন মাঝে মাঝে আমি ভেবে দুঃখ পাই আমাদের স্কুলের ইনস্পেক্টরমশাই কেন সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখেন। 'ওঃ কী পাজী!' আমি ভাবি। 'আচ্ছা ইনি আমার বাবাও নন মাও নন — তা হলে আমি দুষ্টুমি করলে ওর কী আসে যায়? নিজের ঘরে বসে থাকলেই ত বাপু পারেন। না, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, বেচারি ছেলেদের দেখার কেউ না থাকলে তাদের কী দুর্দশাটা হয়!'

এই সব ভাবতে ভাবতে মিশা আরও এগিয়ে চলল — চলতে চলতে থেমে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখে মুক্তার ঝালর লাগানো সোনার তাঁবু। তাঁবুর মাথায় ঘুরছে একটা সোনালি চরকি — যেন বাতাসে চালানো পেষাই কল, আর তাঁবুর নীচে শুয়ে আছেন স্প্রিং-রানী — একটা সাপের মতো, এই কুণ্ডলী পাকাচ্ছেন, এই কুণ্ডলী খুলছেন আর অনবরত পরিদর্শকের পাঁজরে খোঁচা মারছেন। মিশা এতে ভারী আশ্চর্য হয়ে গিয়ে তাঁকে বলল:

'মাননীয়া মহারানী! পরিদর্শক মশাইয়ের পাঁজরে অমন খোঁচা মারছেন কেন?'

'ঝিন্‌-ঝিন্‌-ঝিন্‌!' রানী জবাব দিলেন। 'বোকা ছেলে কোথাকার! মাথায় কোন বুদ্ধি নেই তোমার। তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখলে, কিন্তু দেখেও কিছুই দেখতে পেলে না! আরে, চোঙকে যদি আমি ঠেলা না মারি তাহলে চোঙ ঘুরবে না, চোঙ না ঘুরলে হাতুড়িগুলোও আঁকশিতে আটকাবে না, হাতুড়িগুলো ঘাও মারবে না; হাতুড়ির ঘা না পড়লে ঘণ্টিও বাজবে না, ঘণ্টি না বাজলে বাজনাই থাকত না! ঝিন্‌-ঝিন্‌-ঝিন্‌।'

মিশার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল রানী সত্যি বলছেন কিনা। সে নীচু হয়ে স্প্রিংটাকে আঙুল দিয়ে চেপে ধরল — ফলে কী হল? মুহূর্তের মধ্যে স্প্রিং জোরে লাফিয়ে পাক খুলে ফেলল, চোঙ বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল, হাতুড়িগুলো দ্রুত ঠকাঠক শুরু করে দিল, ঘণ্টিগুলো বেসুরো বাজনা বাজাতে লাগল, তারপর হঠাৎই স্প্রিংটা গেল ভেঙে। সব চুপচাপ হয়ে গেল, চোঙ থেমে গেল, হাতুড়িগুলো পড়ে গেল, ঘণ্টিগুলো একদিকে গিয়ে ঘুরে পড়ল, সূর্যি নেমে গেল, ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল। তখন মিশার মনে পড়ে গেল বাবা স্প্রিং ছুঁতে মানা করে দিয়েছিলেন। সে ভয় পেয়ে গেল, জেগে উঠল।

'স্বপ্নে কী দেখলি, মিশা?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

মিশার সংবিৎ ফিরে পেতে বেশ সময় লাগল। তাকিয়ে দেখে বাবার সেই ঘর, তার সামনে সেই নস্যিদানিটি; পাশে বসে আছেন বাবা আর মা, হাসছেন।

'ঘণ্টি-খোকা গেল কোথায়? হাতুড়ি-খুড়ো কোথায়? স্প্রিং-রানীই বা কোথায়?' মিশা জিজ্ঞেস করল। 'তাহলে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?'

'হ্যাঁ, মিশা বাজনা তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানে তুই বেশ কিছুক্ষণ ঝিমিয়েছিস। তুই অন্তত আমাদের এবারে বল্ স্বপ্নে কী দেখলি!'

'বুঝলে বাবা,' মিশা চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করছিল নস্যিদানির ভেতরে বাজনা বাজে কী করে; তাই আমি বেশ মন দিয়ে নস্যিদানিটা দেখতে লাগলাম, বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম ওটার ভেতরে কী নড়ছে, কী কারণেই বা নড়ছে, ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা প্রায় ধরতে শুরু করেছি এমন সময় দেখি নস্যিদানির ভেতরে একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেছে...' এই বলে মিশা তার স্বপ্নের পুরোপুরি বৃত্তান্ত দিল।

বাবা বললেন, 'হুঁ, এবারে দেখতে পাচ্ছি নস্যিদানির ভেতরে বাজনা কী করে বাজছে তা সত্যিই তুই প্রায় বুঝে ফেলেছিস; তবে ব্যাপারটা তুই আরও ভালো ভাবে বুঝতে পারবি যখন বলবিদ্যা পড়বি।'

মিখাইল লেরমন্তভ

আশিক-কেরিব

অনেক কাল আগে তিফ্‌লিস শহরে বাস করত এক ধনী তুরুক। আল্লাহ তাঁকে অঢেল সোনাদানার মালিক করেছিলেন, কিন্তু সোনাদানার চেয়ে তার কাছে দামী ছিল তার একমাত্র মেয়ে মাগুল-মেগেরি। আকাশের তারারা সুন্দর, কিন্তু তারাদের পেছনে বাস করেন দেবদূতরা, তারা আরও সুন্দর। তেমনি মাগুল-মেগেরিও ছিল তিফ্‌লিসের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে সেরা সুন্দরী।

ঐ তিফ্‌লিসেই আশিক-কেরিব নামে এক গরিব লোকও বাস করত। পয়গম্বর তাকে দরাজ দিল আর গানের ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই দেন নি। সে বিয়ের আসরে ঘুরে

ঘুরে সাজ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বেড়াত, তুর্কীস্তানের প্রাচীন বীরপুরুষদের যশোগান গেয়ে ধনী আর ভাগ্যবান লোকদের মনোরঞ্জন করত। এক বিয়ের আসরে সে মাগুল-মেগেরিকে দেখে, তারা দু'জন দু'জনাকে ভালোবেসে ফেলে। ওর পাণিগ্রহণ করতে পারার আশাভরসা আশিক-কেরিবের খুব কমই ছিল, তাই সে শীতের আকাশের মতো বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

একবার সে বাগানে দ্রাক্ষাকুঞ্জের নীচে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সময় মাগুল-মেগেরি তার সহচরীদের সঙ্গে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। সহচরীদের একজন ঘুমন্ত আশিককে দেখতে পেয়ে সকলের পেছনে রয়ে গেল, তারপর তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সুর করে গান গেয়ে বলল, 'নিদ যাস যে দ্রাক্ষাক্ষেতের নীচে? ওঠ্ রে পাগল, হরিণী তোরে যায়।'

আশিক-কেরিব জেগে উঠতেই মেয়েটা পাখির মতো ফুরুৎ করে পালিয়ে গেল। মাগুল-মেগেরি তার গান শুনতে পেয়ে তাকে গালাগাল করতে লাগল।

মেয়েটি তার উত্তরে বলল, 'তুই যদি জানতিস কাকে আমি এই গান শুনিয়েছি, তাহলে তুই আমাকে ধন্যবাদ দিতিস — ও যে তোর আশিক-কেরিব রে।'

'আমাকে ওর কাছে নিয়ে চল্,' মাগুল-মেগেরি বলল।

ওরা তার কাছে গেল। আশিক-কেরিবের বিষণ্ণ মুখ দেখে মাগুল-মেগেরি তাকে এটা ওটা প্রশ্ন করতে লাগল, সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'মন খারাপ না করে কী করব বল,' আশিক-কেরিব উত্তর দিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, অথচ তোমাকে আমি কখনও পাব না।'

'আমার বাপকে গিয়ে বল যে আমাকে বিয়ে করতে চাও,' সে বলল, 'আমার বাপ নিজের টাকায় আমাদের বিয়ের ভোজ দেবেন, আর আমাকে এত যৌতুক দেবেন যে আমাদের দু'জনেরই কোন অভাব থাকবে না।'

উত্তরে আশিক-কেরিব বলল, 'ভালো কথা, ধরলাম না হয় আয়াক-আগা তাঁর মেয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কোন কার্পণ্য করবেন না; কিন্তু কে বলতে পারে পরে তুমি আমাকে এই বলে খোঁটা দেবে না যে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই, সব কিছুর জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী? না গো আমার মাগুল-মেগেরি, আমি মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি — প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সাত বছর দুনিয়া ঘুরে ঘুরে হয় ধনসম্পদ উপার্জন করব, নয়ত দূর মরুভূমিতে প্রাণ দেব। তুমি যদি এতে রাজী থাক তাহলে ঐ সময় পার হবার পর তুমি হবে আমার।'

সে এতে রাজী হল, কিন্তু যোগ করল যে নির্দিষ্ট দিনে আশিক-কেরিব যদি ফিরে না আসে তাহলে সে কুরশুদ বেগের বৌ হবে। কুরশুদ বেগ অনেককাল হল তার পাণিপ্রার্থনা করছে।

আশিক-কেরিব তার মা'র কাছে এলো। মা'র কাছ থেকে পথযাত্রার জন্য মঙ্গলকামনা নিয়ে, ছোট বোনটিকে চুমু খেয়ে আশিক-কেরিব কাঁধে থলি ঝুলিয়ে নিল, মুসাফিরের ধরনে লাঠির

ওপর ভর দিল, তারপর বেরিয়ে পড়ল তিফ্‌লিস শহর থেকে। এক ঘোড়সওয়ার এসে তার নাগাল ধরল -- তাকিয়ে দেখে লোকটা আর কেউ নয়, কুরশুদ বেগ।

'শুভযাত্রা।' চেঁচিয়ে তাকে বলল বেগ। 'তুমি যেখানেই যাও না কেন মুসাফির, আমি তোমার সাথী।'

এমন সাথী পেয়ে আশিক খুশি হতে পারল না, কিন্তু কিছু করারও নেই। অনেকক্ষণ তারা একসঙ্গে চলল। চলতে চলতে শেষকালে সামনে দেখতে পেল একটা নদী। না আছে নদীর ওপর কোন সাঁকো, না আছে নদীর কোথাও হাঁটুজল।

'তুমি আগে আগে সাঁতার কেটে চল, আমি তোমার পরে আসছি,' কুরশুদ বেগ বলল।

আশিক ওপরের বস্ত্র খুলে ফেলে জলে নামল। ওপারে পেঁাছনোর পর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে — হায় পরম শক্তিমান আল্লাহ্‌! কী সাংঘাতিক! — কুরশুদ বেগ তার বস্ত্র তুলে নিয়ে ফিরতি পথে, তিফ্‌লিসের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে সমতল মাঠের ওপর সর্পিলাকারে উঠছে ধুলোর কুণ্ডলী।

ঘোড়া ছুটিয়ে তিফ্‌লিসে আসার পর বেগ পোশাকটা আশিক-কেরিবের বুড়ি মাকে নিয়ে গিয়ে দেখাল। তাকে বলল, 'তোমার ছেলে ভরা নদীতে ডুবে মরেছে, এই দেখ তার জামাকাপড়।'

প্রিয় ছেলের জামাকাপড় দেখতে পেয়ে মা মনে যা কষ্ট পেল তা বর্ণনা করা যায় না, ছেলের পোশাকের ওপর সে অঝোরে তপ্ত অশ্রু ঝরাতে লাগল; তারপর সেগুলো নিয়ে তার বাগদত্তা পুত্রবধু মাগুল-মেগেরির কাছে গিয়ে বলল, 'আমার ছেলে জলে ডুবে মারা গেছে। কুরশুদ বেগ ওর জামাকাপড় নিয়ে এসেছে। তুমি মুক্ত।'

মাগুল-মেগেরি মৃদু হেসে তার উত্তরে বলল, 'বিশ্বাস করো না, এসবই ঐ কুরশুদ বেগের কারসাজি। সাত বছর পার হওয়ার আগে কেউ আমার স্বামী হবে না।'

এই বলে দেয়ালের গা থেকে নিজের সাজ যন্ত্রটা তুলে নিয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে গাইতে শুরু করল বেচারি আশিক-কেরিবের প্রিয় একটা গান।

ইতিমধ্যে মুসাফির আশিক খালি পায়ে নাঙ্গা অবস্থায় এক গ্রামে এসে উপস্থিত হল। গ্রামের ভালোমানুষ লোকজন তাকে গায়ের জামাকাপড় দিল, খাওয়াল, তার বদলে সে ওদের চমৎকার চমৎকার গান গেয়ে শোনাল। এই ভাবে সে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর পার হয়ে চলল, তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে সে এলো হালাফে। তার যে রকম রীতি সেই অনুযায়ী সে একটা কফিখানায় ঢুকল, সেখানে সাজ বাদ্যযন্ত্র চেয়ে নিয়ে সে গান গাইতে শুরু করল। সেই সময় হালাফে ছিলেন এক পাশা। তিনি ছিলেন চারণদের খুব বড় সমজদার। ঐ রকম বহু গায়ককে তাঁর কাছে আনা হয় — কিন্তু কাউকেই তাঁর পছন্দ হয় না। তাঁর চৌশিরা (অনুচর, প্রহরী) সারা শহর ছুটোছুটি করে হয়রান। হঠাৎ কফিখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা শুনতে পেল অপূর্ব কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে তারাও সেখানে।

'আমাদের সঙ্গে চল্‌ মহামান্য পাশার কাছে,' তারা হাঁক পাড়ল, 'নইলে তোর গর্দান যাবে!'

'আমি স্বাধীন মানুষ, মুসাফির, এসেছি তিফ্‌লিস শহর থেকে,' আশিক-কেরিব বলল, 'ইচ্ছে হলে যাব, নাহলে যাব না। যখন মেজাজ আসে তখন গান গাই, তাছাড়া তোমাদের পাশা আমার ওপরওয়ালাও নন।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা তাকে পাকড়াও করে পাশার কাছে নিয়ে গেল।

'গান গাও,' পাশা বললেন।

আশিক গান ধরল। এই গানে সে তার প্রিয়তমা মাগুল-মেগেরির গুণ কীর্তন করল। গানটা দেমাকি পাশার এত মনে ধরল যে তিনি গরীব মুসাফির আশিক-কেরিবকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

তার ওপর সোনা রুপোর বর্ষণ চলল, তার অঙ্গে ঝকঝক করতে লাগল দামী দামী পোশাক। আশিক-কেরিব সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে হাসিফুর্তিতে দিন কাটাতে লাগল। সে দারুণ ধনী বনে গেল। সে তার মাগুল-মেগেরিকে ভুলে গিয়েছিল কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক যে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। শেষ বছরটি শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই, অথচ যাবার জন্য তার তৈরি হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

সুন্দরী মাগুল-মেগেরি হতাশ হয়ে পড়ল। এই সময় এক বণিক চল্লিশটি উট আর আশিজন দাসের একটা কারাভান নিয়ে তিফ্‌লিস থেকে যাত্রা করছিল। মাগুল-মেগেরি বণিককে ডেকে এনে একটা সোনার থালা দিয়ে বলল, 'এই থালাটা সঙ্গে নাও, যেই শহরেই যাও না কেন তোমার দোকানে এই থালাটা সাজিয়ে রেখে সর্বত্র জানিয়ে দেবে আমার থালার মালিকানা যে স্বীকার করবে এবং তা প্রমাণ করতে পারবে সে এটা ত পাবেই, সেই সঙ্গে তার সমান পরিমাণ ওজনের সোনাও পাবে।'

বণিক যাত্রা করল, সর্বত্র সে মাগুল-মেগেরির দেয়া দায়িত্ব পালন করল, কিন্তু কেউই সোনার থালার মালিকানা স্বীকার করল না। দেখতে দেখতে সে প্রায় তার সমস্ত পণ্যদ্রব্য বেচে বাকি যেটুকু ছিল তা নিয়ে এলো হালাফে। মাগুল-মেগেরির আজ্ঞা সর্বত্র জানিয়ে দিল। একথা শুনতে পেয়ে আশিক-কেরিব ছুটে এলো কারাভান সরাইয়ে — এসে দেখতে পেল তিফ্‌লিসের বণিকের দোকানে শোভা পাচ্ছে সোনার থালা।

'এটা আমার!' এই বলে সে খপ করে থালাটা ধরল।

'তোমারই বটে,' বণিক বলল, 'তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি আশিক-কেরিব। যত তাড়াতাড়ি পার তিফ্‌লিসে যাও, তোমার মাগুল-মেগেরি তোমাকে বলতে বলেছে যে সময় চলে যাচ্ছে, নির্দিষ্ট দিনে তুমি না এলে সে আরেক জনকে বিয়ে করবে।'

আশিক-কেরিব হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল — সর্বনাশ! সময় শেষ হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। তবু সে ঘোড়ায় চেপে বসল, বেশ কিছু পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিল, দাবড়ে

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত দৌড়বাজ ঘোড়াটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তার প্রাণহীন দেহ আর্জিনিয়ান ও আর্জের্‌মের মাঝখানে আর্জিনগান পাহাড়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। কী করবে এখন সে? -- আর্জিনিয়ান থেকে তিফ্‌লিস কোন যানে চেপে গেলেও দু'মাসের পথ, কিন্তু হাতে আছে মাত্র দুটো দিন।

'পরম শক্তিমান আল্লাহ্‌!' সে চেঁচিয়ে বলল। 'তুমি যদি আমাকে এখন সাহায্য না কর তাহলে এই দুনিয়ায় আমার আর কিছু করার নেই!' এই বলে সে পাহাড়ের উঁচু মাথা থেকে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় নীচে দেখতে পেল সাদা ঘোড়ার পিঠে এক সওয়ার, শুনতে পেল জোর গলার আওয়াজ:

'এই ছোকরা, তোমার মতলবটা কী?'

'মরার ইচ্ছে আমার,' আশিক উত্তর দিল।

'তাই যদি হয় তাহলে নেমে এসো, আমি তোমাকে খুন করব।'

আশিক কোন রকমে পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এলো।

'আমার পেছন পেছন চলে এসো,' ধমকের সুরে বলল ঘোড়সওয়ার।

'তোমার পেছন পেছন আমি আসব কী করে?' আশিক জিজ্ঞেস করল। 'তোমার ঘোড়া যে বাতাসের বেগে ছুটছে, এদিকে আমার থলেটাও বড় ভারী।'

'ঠিকই ত। তোমার থলেটা জিনে ঝুলিয়ে পেছন পেছন চল।'

আশিক-কেরিব অনেক চেষ্টা করে দৌড়ানো সত্ত্বেও পিছে পড়ে গেল।

'পিছে পড়ে রইলে যে?' ঘোড়সওয়ার জিজ্ঞেস করল।

'কী করে আমি তোমার পিছু নেব বল, তোমার ঘোড়া যে ভাবনার চেয়েও জোরে ছুটছে! আমি এর মধ্যেই হয়রান হয়ে পড়েছি।'

'ঠিকই ত। আমার পেছনে ঘোড়ার পিঠে উঠে বোস, কোন লুকোচুরি না করে সত্যি করে বল দেখি আমাকে — কোথায় তোমাকে যেতে হবে?'

'আজকের মধ্যে অন্তত আর্জের্‌ম পেঁছুতে পারলে হত,' আশিক উত্তর দিল।

'চোখ বন্ধ কর।' আশিক তার কথায় চোখ বন্ধ করল। 'এবারে চোখ খোল।'

আশিক তাকিয়ে দেখল তার সামনে আর্জের্‌মের সাদা ধবধবে দেয়াল আর ঝলমলে মিনার!

'অপরাধ হয়ে গেছে আগা,' আশিক বলল, 'আমারই ভুল, আমি বলতে চাইছিলাম আমার কার্সে পেঁছুনো দরকার।'

'বটে, বটে,' ঘোড়সওয়ার বলল, 'আমি না তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে নির্ভেজাল সত্যি কথা বলবে! ফের চোখ বন্ধ কর। এবারে খোল।'

নিজের চোখে দেখেও আশিক বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এটা কার্স। সে নতজানু হয়ে বলল, 'অপরাধ হয়ে গেছে, আগা, তোমার সেবক আশিক-কেরিব তোমার কাছে অশেষ অপরাধে

অপরাধী। কিন্তু তুমি নিজেই জান যে কোন লোক যদি ভোর বেলা থেকে মিথ্যে বলবে বলে ঠিক করে তাহলে দিনের শেষ পর্যন্ত তাকে মিথ্যে বলে যেতে হবে — আসলে, আমাকে যেতে হবে তিফ্লিসে।'

'কী বেইমান!' ঘোড়সওয়ার রেগে বলল। 'কিন্তু কিছু করার নেই, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। চোখ বন্ধ কর দেখি। এবারে খোল,' এক মুহূর্তে পরেই সে যোগ করল।

আশিক সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল: ওরা এসে গেছে তিফ্লিসের তোরণের সামনে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে জিন থেকে নিজের থলেটা নিয়ে আশিক-কেরিব ঘোড়সওয়ারকে বলল, 'আগা, তুমি অবশ্যই আমার পরম উপকার করেছ, কিন্তু আরও একটু উপকার কর; এখন যদি আমি লোকের কাছে বলি যে একদিনে আর্জিনিয়ান থেকে তিফ্লিসে এসেছি তাহলে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। প্রমাণ হিসেবে কিছু একটা আমাকে দাও।'

ঘোড়সওয়ার মৃদু হেসে বলল, 'হেঁট হয়ে ঘোড়ার খুরের তলা থেকে এক ডেলা মাটি তুলে নিয়ে তোমার পোশাকের নীচে গুঁজে রাখ। লোকে যদি তোমার কথায় সত্যি সত্যিই বিশ্বাস না করে তাহলে তাদের বলো সাত বছর হল অন্ধ হয়ে আছে এমন কোন স্ত্রীলোককে যেন তোমার কাছে নিয়ে আসে, তার চোখে এই মাটি ঘষে দিও — সে চোখে দেখতে পাবে।'

আশিক সাদা ঘোড়ার খুরের তলা থেকে মাটির ডেলা তুলে নিল, কিন্তু মাথা তুলতেই দেখে ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়া দুইই অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখন সে মনে মনে নিশ্চিত হল যে তার হিতৈষী হাদেরিলিয়াজ (সেণ্ট জর্জ) ছাড়া আর কেউ নন।

আশিক-কেরিব যখন নিজের বাড়ি খুঁজে বার করল ততক্ষণে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে সে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলল, 'আনা, আনা (মা), দরজা খোলো — আমি খোদাতাল্লার মেহমান; আমি ঠাণ্ডায় জমে গেছি, আমার খিদে পেয়েছে। দয়া করে তোমার মুসাফির ছেলের কথা ভেবে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।'

বৃদ্ধা ক্ষীণকণ্ঠে তাকে জবাব দিল, 'পথিকের রাতের আশ্রয়ের জন্য ধনী আর সমর্থ লোকদের বাড়ি আছে; শহরে এখন বিয়ের ভোজসভাও চলছে — ওখানে চলে যাও! ওখানে দিব্যি রাত কাটাতে পারবে।'

আশিক তার উত্তরে বলল, 'আনা, এখানে আমার চেনা জানা কেউ নেই, তাই আরও একবার অনুরোধ করছি — তোমার মুসাফির ছেলের কথা ভেবে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও!'

তখন তার বোন মাকে বলল, 'মা, আমি উঠে দরজা খুলে দিই ওকে।'

'হতচ্ছাড়ী!' বৃদ্ধা বলল। 'আজ সাত বছর হল আমি কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি কিনা, তাই অল্পবয়সী ছেলেছোকরাদের ঘরে ডেকে এনে আপ্যায়ন করার বড় সাধ তোর!'

কিন্তু মেয়ে তার গালিগালাজে আমল না দিয়ে উঠে দরজা খুলে আশিক-কেরিবকে ভেতরে আসতে দিল। গতানুগতিক সম্ভাষণের পর সে বসল, উত্তেজনা মনে মনে চেপে রেখে চারদিকে

তাকিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে পেল দেয়ালের গায়ে ধুলো-পড়া খোলের ভেতরে ঝুলছে তার মিঠে আওয়াজের সাজ বাদ্যযন্ত্রটা। সে তখন মাকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা তোমাদের দেয়ালে ওটা কী ঝুলছে?'

'বড় বেশি জানতে চাও দেখছি তুমি, মেহমান,' বৃদ্ধা বলল, 'তোমাকে এক টুকরো রুটি দিয়ে আগামীকাল যদি আল্লার নামে ছেড়ে দিই সেটাই কি যথেষ্ট হবে না তোমার পক্ষে?'

আশিক তার কথায় আপত্তি তুলে বলল, 'আমি ত তোমাকে আগেই বলেছি যে তুমি আমার গর্ভধারিণী মা, আর এ হল আমার বোন, সেই জন্যই ত তোমার কাছে আমার মিনতি, বলোই না দেয়ালের গায়ে ওটা কী ঝুলছে।'

'ওটা সাজ, সাজ,' বৃদ্ধা রাগতস্বরে বলল, আশিকের কথায় তার বিশ্বাস হল না।

'সাজ মানে?'

'সাজ হল একটা জিনিস যা বাজিয়ে লোকে গান গায়।'

আশিক-কেরিব অনুরোধ করল বৃদ্ধা যেন বোনকে দেয়ালের গা থেকে সাজটা নামিয়ে এনে তাকে দেখানোর অনুমতি দেয়।

'তা হয় না,' বৃদ্ধার জবাব, 'এই সাজ আমার হতভাগ্য ছেলের; আজ সাত বছর হয়ে গেল দেয়ালের গায়ে ঝুলছে, কারও জীবন্ত হাতের ছোঁয়া ওটাতে লাগে নি।'

কিন্তু আশিকের বোন উঠে গিয়ে দেয়ালের গা থেকে সাজটা নামিয়ে তাকে দিল। তখন সে ঊর্ধ্বপানে চোখ তুলে উচ্চারণ করল এই প্রার্থনা: 'হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্! আমার পক্ষে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি যদি সম্ভবই হয় তা হলে আমার সাত তারের সাজ সেই দিনের মতো সুরে বাঁধা হোক, যেদিন শেষবার আমি ওটা বাজাই!' এই বলে সে তামার তারের ওপর আঘাত করল, তারে সুরের ঝঙ্কার উঠল। সে গাইতে শুরু করল: 'আমি নিঃস্ব কেরিব (গরিব) — আমার ভাষাও নিঃস্ব; কিন্তু পরমপুরুষ হাদেরিলিয়াজ আমাকে খাড়া পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসতে সাহায্য করেছেন, যদিও আমি নিঃস্ব, আমার ভাষাও নিঃস্ব। আমাকে চিনতে পারছ না মা, চিনতে পারছ না তোমার মুসাফির ছেলেকে?'

এরপর তার মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'রশিদ (সাহসী),' সে জবাব দিল।

'এতক্ষণ ত তুমি কথা বললে, এবারে শোন রশিদ,' বৃদ্ধা বলল, 'তোমার কথায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, এদিকে আজ সাত বছর হল আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছি। ওর গলার স্বর তোমার আছে দেখছি, তুমিই আমাকে বল আমার বেটা কবে আসবে।'

দু'বার ছলছল চোখে সে তাকে এই প্রশ্ন করল। বৃথাই আশিক তাকে বলেছিল যে সে তার ছেলে, মা তার কথা বিশ্বাস করল না। কিছুক্ষণ বাদে আশিক তার কাছে আর্জি জানাল:

'মা, এই সাজটা নিয়ে আমাকে যেতে অনুমতি দিন। আমি শুনেছি এখানে কাছাকাছি কোথায় নাকি বিয়ের আসর চলছে; বোন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে; আমি গান করব, বাজনা বাজাব, যা পাব তার সবটা এখানে নিয়ে এসে আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করব।'

'না তা হবে না,' বৃদ্ধা বলল, 'আমার ছেলে চলে যাবার পর থেকে তার সাজ কখনও বাড়ির বাইরে যায় নি।'

কিন্তু সে বারবার শপথ করে বলল যে একটা তারও নষ্ট করবে না। আশিক আরও বলল 'যদি একটা তারও নষ্ট হয় তাহলে আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিও।'

বৃদ্ধা আশিকের থলি হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখল, থলিটা যে মুদ্রায় ভরতি তা বুঝতে পেরে আশিককে অনুমতি দিল। বিয়ের ভোজের হৈ হুল্লোড় যেখানে চলছে সেই ধনী বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বোন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল কী হয় শোনার জন্য।

ঐ বাড়িতে বাস করত মাগুল-মেগেরি, আর ঐ রাতেই কুরশুদ বেগের স্ত্রী হওয়ার কথা তার। কুরশুদ বেগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভোজে মেতে আছে, এদিকে মাগুল-মেগেরি মহামূল্যবান পর্দার আড়ালে তার সহচরীদের সঙ্গে বসে আছে এক হাতে বিষের পেয়ালা আর অন্য হাতে ধারাল খঞ্জর নিয়ে — সে প্রতিজ্ঞা করেছে কুরশুদ বেগের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে বরং মারা যাবে সেও ভালো। এমন সময় পর্দার আড়াল থেকে শুনতে পেল কে এক অজানা পুরুষ আসরে এসে বলছে:

'সেলাম আলেকুম! আপনারা এখানে আমোদপ্রমোদ খানাপিনা করছেন, অনুমতি করেন ত গরিব মুসাফিরও আপনাদের সঙ্গে বসে, আমি কিন্তু গান গেয়ে শোনাব আপনাদের।'

'তাতে আর আপত্তির কী আছে?' কুরশুদ বেগ বলল। 'এখানে গাইয়ে বাজিয়েদের স্থান অবারিত থাকাই উচিত, কেন না এটা হল বিয়ের আসর। গাও হে কিছু একটা — আমি পুরো এক মুঠো সোনা দেব।'

তারপর কুরশুদ বেগ তাকে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার নাম কী মুসাফির?'

'শিন্দি গেরুর্সেজ (শিগগির জানতে পারবে)।'

'এটা আবার কী নাম!' কুরশুদ বেগ অবাক হয়ে হাসতে হাসতে বলল। 'এই প্রথম এমন নাম শুনছি।'

'আমি যখন আমার মা'র পেটে তখন এবং আমাকে প্রসব করার সময় আমার মা খুব কষ্ট পান। সেই সময় পাড়াপড়শীরা অনেকে আঁতুর ঘরের দরজার সামনে এসে জিজ্ঞেস করে ছেলে না মেয়ে কী দিলেন তাঁকে আল্লাহ, তখন তাদের জবাব দেয়া হয়: শিন্দি-গেরুর্সেজ (শিগগির জানতে পারবে)। তাই আমি যখন জন্মালাম তখন আমাকে এই নাম দেওয়া হল।' এর পর সে সাজ নিয়ে গাইতে শুরু করে দিল:

'হালাফ নগরে আমি মিসির শরাব পান করলাম, কিন্তু আল্লাহ আমাকে ডানা দিলেন, আমি এক দিনে এখানে উড়ে চলে এলাম।'

কুরশুদ বেগের ভাইয়ের মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জর বার করে চিৎকার করে বলল, 'মিথ্যে কথা! হালাফ থেকে এখানে কী করে আসা সম্ভব?'

'তুমি আমাকে খুন করতে চাও কেন বলো ত?' আশিক বলল। 'গাইয়েরা সচরাচর চতুর্দিক থেকে একস্থানে এসে জড় হয়; তাছাড়া আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নিচ্ছি না; আমাকে বিশ্বাস করো আর না করো সে তোমাদের ব্যাপার।'

'ছেড়ে দে, গান চালিয়ে যাক,' পাত্র বলল।

একথায় আশিক-কেরিব ফের গান ধরল:

'ফজরের নামাজ আমি সারলাম আর্জিনিয়ান উপত্যকায়, দুপুরের নামাজ আর্জেরুম শহরে; সূর্যাস্তের আগে নামাজ সারলাম কার্স শহরে, আর সন্ধ্যার নামাজ তিফ্লিসে। আল্লাহ আমাকে ডানা দিলেন, তাইতে আমি এখানে উড়ে এলাম। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন আমি সাদা ঘোড়ার কাছে জান কুরবান করতে পারি — দড়ির ওপরে কসরৎকারী নাচিয়ের মতো সে পাহাড় থেকে গিরিখাতে, গিরিখাত থেকে পাহাড়ে জোর কদমে ছুটে চলে। মাউলিয়াম (স্রষ্টা) আমাকে ডানা দিলেন, আমি তাই উড়ে এলাম মাগুল-মেগেরির বিয়ের আসরে।'

তখন তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেয়ে মাগুল-মেগেরি ছুঁড়ে ফেলে দিল এক দিকে বিষের পাত্র, অন্য দিকে ধারাল খঞ্জর।

'এই হল তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা!' তার সহচরীরা তাকে বলল। 'তাহলে আজ রাতে তুই কুরশুদ বেগের বিবি হবি?'

'তোরা চিনতে না পারলে কী হবে, আমি কিন্তু ঠিকই চিনতে পেরেছি আমার সেই আদরের কণ্ঠস্বর,' উত্তরে এই বলে কাঁচি নিয়ে সে পড়পড় করে পর্দা কেটে ফেলে। দেখার পর তখন আর তার কোন সন্দেহই রইল না যে লোকটা আশিক-কেরিব, তক্ষুনি সে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে দু'হাতে তার কাঁধ জড়িয়ে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল — দু'জনেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কুরশুদ বেগের ভাই খঞ্জর হাতে ধেয়ে এলো তাদের দিকে — তার উদ্দেশ্য ছিল দু'জনকেই খুন করা, কিন্তু কুরশুদ বেগ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'শান্ত হ, জেনে রাখ, জন্মকালে লোকের কপালে যা লেখা আছে কারও সাধ্যি নেই তা খণ্ডায়।'

জ্ঞান ফেরার পর মাগুল-মেগেরি লজ্জায় লাল হয়ে গেল, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

'এবারে ঠিকই দেখা যাচ্ছে তুমি আশিক-কেরিব,' পাত্র বলল, 'কিন্তু বল দেখি এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে এত দূর পথ পাড়ি দিলে?'

আশিক উত্তর দিল, 'আমি যদি সত্যি বলে থাকি তার প্রমাণ হবে এই যে আমার তলোয়ার পাথর কেটে বসে যাবে, আর যদি মিথ্যে বলে থাকি তাহলে আমার গর্দান একটা চুলের থেকেও সরু হয়ে যাবে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমরা আমাকে এমন কোন অন্ধ স্ত্রীলোকের কাছে নিয়ে যাও যে আজ সাত বছর হল খোদাতাল্লার এই দুনিয়াকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, আমি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব।'

আশিক-কেরিবের বোন তখন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। এই কথা শুনতে পেয়ে সে মা'র কাছে ছুটে গেল।

'মা গো!' বোন চেঁচিয়ে বলল। এ ত সত্যিই দেখছি আমার ভাই, সত্যিই তোমার বেটা আশিক-কেরিব,' এই বলে হাত ধরে টানতে টানতে বৃদ্ধাকে নিয়ে এলো বিয়ের ভোজসভায়।

তখন আশিক তার পোশাকের ভেতর থেকে মাটির ডেলা নিয়ে জলে গুলে মা'র চোখে লেপে দিয়ে বলল:

'হাদেরিলিয়াজ যে কত শক্তিমান আর কত মহান তা সকলে জানুক!'

মা'র চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। এরপর কেউ আর তার কথার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারল না। কুরশুদ বেগও বিনা বাক্যব্যয়ে সুন্দরী মাগুল-মেগেরির ওপর নিজের অধিকার ছেড়ে দিল।

তখন আশিক-কেরিব খুশি হয়ে বলল, 'শোন কুরশুদ বেগ তোমাকে আমি একটা সান্ত্বনা দিই — আমার বোন তোমার আগেকার পাত্রীর চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দরী নয়, আমি বড়লোক: কোন অংশে কম সোনারুপো ও পাবে না; তাই বলি কি ওকে নাও — আমি আমার প্রিয়তমা মাগুল-মেগেরির সঙ্গে যেমন সুখী তোমরাও তেমনি সুখী হবে।'

ভ্লাদিমির দাল্

বিড়াল ও খেঁকশিয়ালী

কোন এক লোকের একটি বিড়াল ছিল। তার বয়স যখন কম ছিল তখন সে ইঁদুর ধরত, কিন্তু বুড়ো বয়সে কুঁড়েমি এসে তাকে ভর করল; কিংবা এও হতে পারে যে তার কোমরে বাত ধরেছিল। যাই হোক না কেন, মোটকথা বাড়ি আর গেরস্থালির পক্ষে সে অচল হয়ে পড়ল, কোন কাজেই সে আর লাগে না। আর বাড়ির লোকে তাকে খেতে দিত না বলে সে নিজেই তার খাদ্য শিকার করতে শুরু করে দিল— তবে আগের মতন এখন আর ইঁদুর নয়, দুধটা, ননীটা, মাখনটা, ছানাটা — এই সব। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, খাবারগুলো তার মুখে বেশ রুচত। শেষকালে বাড়ির কর্ত্রী

তার স্বামীকে গালিগালাজ করে বলল সে দেখেও দেখছে না কেন, বাড়িতে অমন একটা বিড়াল পুষে রেখেছে, যেটা লাই পেয়ে পেয়ে একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে, কোন ইঁদুরের একটা লেজ অবধি দাঁতে কাটে নি, দিনের পর দিন দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছে। কর্ত্রী বলল, 'প্রথমত, আমি শুনেছি ইঁদুরগুলো পর্যন্ত আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে; দ্বিতীয়ত, বিড়ালটা আমাদের নিজেদের জীবনও অতিষ্ঠ করে তুলেছে — কত আর চোখে চোখে রাখা যায়?'

'তা আমার ওপর অত হম্বিতম্বি কেন? নিজে কোন ব্যবস্থা করলেই হয়। ওটা কি আমার পোষ্যপুত্র নাকি?'

কর্ত্রী বলল এটা মেয়েমানুষের কম্ম নয়, বিড়ালকে বনে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসা পুরুষ মানুষের কাজ — যখন জ্বালানি কাঠ আনতে বনে যাবে তখন ওটাকে ওখানে ফেলে আসতে হবে। লোকটা তা-ই করল: জ্বালানি কাঠ আনতে বনে যাবার সময় সে বিড়ালটাকে বস্তায় পুরে সঙ্গে নিল। প্রচুর শুকনো ডালপালা সে যোগাড় করল। কাজ শেষ হয়ে গেলে বস্তার মুখ খুলে বেচারি বিড়ালটাকে একটা খাতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। বিড়াল মনে মনে ভাবল, 'কুকুর যদি হতাম তাহলে এখন গাড়ির পেছন পেছন ছুটতাম; কিন্তু আমার এই স্বভাব নিয়ে তা করা সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে এখানে থেকে পচে মরতে হবে!'

'পেন্নাম হই মার্জারমশাই!' এই অতিথিটিকে দেখে বলল খেঁকশিয়ালী ঠাকরুন।

'পেন্নাম হই, যদি আপনার তাই অভিরুচি হয়,' এই বলে বিড়াল মুখ ফিরিয়ে নিল, কেননা লোকটার ওপর সে রেগে ছিল।

'আমাদের এখানে তুমি এলে কী করে? কী উদ্দেশ্যে আগমন?'

মার্জারমশাই আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বলল।

'খাওয়াদাওয়ার পর একটু কাত হওয়া অভ্যেস ছিল, তাই চেহারাটা আমার অমন খোলতাই,' সে বলল, 'কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে যাওয়াতে কারও কোন কাজে আসি না, তাই এখন খারাপ আচরণের জন্যে আমাকে এখানে নির্বাসন দিয়েছে ওরা। দফা-রফা হল আর কি।'

'সবুর কর,' খেঁকশিয়ালী মনে মনে ভাবল, 'আচ্ছা এই ঘটনা থেকে কোন ফায়দা ওঠানো যায় না কি? মার্জারমশাই এমনই এক জন্তু যে এখানে বনে কেউ তাকে দেখে নি, জানেও না — ওকে দিয়ে বনের সবাইকে ভড়কে দেওয়া যেতে পারে।'

খেঁকশিয়ালী বলল, 'আমি যা বলি শোন, মার্জারমশাই। তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। চল, আমার সঙ্গে থাকবে — বড় একটা কিছু অবশ্য আশা করো না, আমরা খুবই সাধারণ লোক, তবে ভগবান যা দিয়েছেন তোমার আপত্তি না থাকলে তাই ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে।'

'ভালো কথার জন্যে ধন্যবাদ,' মার্জারমশাই বলল, 'চল।'

খেঁকশিয়ালী তার বাসার গর্তটা আরও চওড়া করে খুঁড়ল, গর্তের মুখটা অনেকখানি

চওড়া করল, যাতে দেখতে অনেকটা ভয়াবহ গোছের হয়; তারপর বিড়ালকে গর্তের ভেতরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে বলল। এদিকে নিজে ছুটে গেল জন্তুজানোয়ারদের ডেকে জড় করতে।

ছোট বড় সমস্ত জন্তুজানোয়ার এসে জড় হল খেঁকশিয়ালী কী বলে শোনার জন্য। খেঁকশিয়ালী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাল, সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে নানা রকম শুভ কামনা করে বলল:

'আমাদের এই জেলায় কী ঘটতে চলেছে তোমরা শুনেছ কি বন্ধুরা? আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে এক নতুন মোড়লকে — যা ভয়ঙ্কর দেখতে! অমন আমরা এর আগে কখনও দেখি নি। আমাদের দুর্দিন শুরু হল। তার নাম হল মার্জারমশাই; মুখের ওপর তার ইয়া গোঁফ, জিভ কাঁটার মতো, চোখজোড়া মোমবাতির মতো, নখ যেন খেত আঁচড়ানোর বিদাকাঠি, লেজ সাপের মতো, গায়ের লোম নরম, আর মাথায় তার যত রাজ্যের দুষ্টবুদ্ধি! যখন ঘুমোয় তখন মানুষের মতন নাক ডাকায়, আর যখন জেগে থাকে তখন আমি শুনেছি বলে কেবল একটি কথাই — কেবলই চিৎকার করে বলে, 'আউর লাও, আউর লাও' — তা যত ভেটই তার কাছে নিয়ে এসো না কেন। শোন বন্ধুরা, ইতিমধ্যেই সে আমাকে আমার বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে! আমার গরিবখানা তার মনে ধরেছে। তা যাক গে, তার জন্য আমার দুঃখু নেই — আমার মনে আঘাত দিলেও তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলা সাজে না। আমি আমার তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে কোন গাছের গুঁড়ির নীচে বা কুয়োর ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতাম, কিন্তু সে আমাকে যেতে দিচ্ছে না, হুকুম করছে তার খাবার যোগাড় করে দিতে। এ কাজ আমার একার সাধ্যি নয়। আমি নিজের আর আমার অল্পসংখ্যক যে ক'জন চাকর-বাকর আছে, সবাই না খেয়ে বসে আছি, এদিকে আমি যা জমিয়েছিলাম, শিকার করে মেরে এনেছিলাম সে সবই আমাদের মোড়লমশাই একা খেয়ে বসে আছেন। এখন আমার ওপর হুকুম হয়েছে আমি যেন তোমাদের সকলকে জড় করি, সকলকে জানিয়ে দিই, মনে করিয়ে দিই নতুন মোড়ল মার্জারমশাইকে সকলে যেন সমীহ করে চলে। আমাদের সমাজের ওপর তার আদেশ হয়েছে তার জন্যে খাবারের ভাগ দেবার, যাতে রোজ পাতে মাংস পড়ে। বন্ধুগণ, এর চেয়ে বেশি আমার আর কিছু বলার নেই, কী করা উচিত তোমরাই ভালো জান — তোমরা আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। তবে বলে রাখছি আমাদের নতুন মোড়লটি সর্বক্ষণ রেগে আছে, দারুণ রাগী!'

সভায় কোলাহল উঠল, সাগরের ঢেউয়ের মতো চাঞ্চল্য দেখা দিল। 'যত দিন যাচ্ছে ততই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে,' গা চুলকোতে চুলকোতে বলল ভালুক। কিন্তু সভায় যার ওপর যা দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিতে কেউই অস্বীকার করল না। প্রত্যেকেই তাকে খেঁকশিয়ালীর বাড়ির আঙ্গিনায় কখন কী নিয়ে যেতে হবে মনে করতে করতে যে যার জায়গায় চলে গেল। তবে প্রথম

কর্তব্য হিসেবে ঠিক করা হল কাল সকলে মিলে মার্জারমশাইকে নমস্কার জানাতে যাবে আর সকলেই একটা না একটা কিছু ভেট নিয়ে যাবে।

সকলে এসে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তাদের সমস্ত ভেট রাখল — নেকড়ে নিয়ে এসেছে একটা বাছুরের চার ভাগের এক ভাগ, ভালুক মধুর মদ তৈরি করে এনেছে, খট্টাশ পালক ছাড়িয়ে সাফ করে এনেছে একটা হাঁস, তার বৌ এনেছে এক জোড়া ডিম — এক কথায়, যে যা পেয়েছে। উপহার মাটিতে রেখে তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, ভেতরে যাবার সাহস কারও হল না। গর্তের ভেতর থেকে মাথা বাড়িয়ে খেঁকশিয়ালী ফিসফিস করে সকলকে অভিনন্দন জানাল।

'আমাদের মোড়লমশাই এখনও বিশ্রাম করছেন,' সে বলল, 'কিন্তু তাকে জাগানোর সাহস আমার নেই: বড় বদমেজাজী! ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর গো ভালোমানুষেরা।'

'শোন দিদি...' ভালুক কিছু একটা বলতে গেল।

কিন্তু খেঁকশিয়ালী ফের মাথা বার করে বলল:

'না, ভল্লুক বাবাজী, মাফ করবে — আমি এখন আর দিদি-টিদি নই, আমি হলাম গিয়ে মোড়লগিন্নি। মার্জারমশাইকে যখন ওপরওয়ালা করে আমাদের এখানে পাঠানো হয় তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন, আর আমিও, তোমরা নিজেরাই জান অনাথা বিধবা — কত টানাটানি করেই না আমাকে সংসার চালাতে হয়েছে! এখন উনি আমার ওপর সদয় হয়েছেন, আমি যে ওঁকে এত বিশ্বস্ত ভাবে সেবা করেছি তার পুরস্কার আমাকে দিয়েছেন — আমাকে তাঁর ঘরের কর্ত্রীর সম্মান দিয়েছেন; তাই বলি কি মনের মধ্যে কোন খুঁতখুঁতানি না রেখে আমাকে খেঁকশিয়ালী ঠাকরুন বলে ডাকবে।'

জন্তুজানোয়াররা সকলে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল, হতভম্ব হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, চুপ করে গেল। এদিকে ভালুক মাথা নীচু করে নিজের থাবা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নখ ভালো করে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে খেঁকশিয়ালী বেরিয়ে এসে বয়োবৃদ্ধদের ডেকে বলল তারা যেন একে একে এগিয়ে আসে মোড়লকে নমস্কার জানাতে, তাকে বেশ নীচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে খাবার আমন্ত্রণ জানায়।

সকলেই ভয়ে তটস্থ, কারও জায়গা ছেড়ে নড়ার নাম নেই — কেবল এ ওর দিকে তাকিয়ে বলে: 'তুই আগে যা, যা না!'

অবশেষে তারা বিবেচনা করে দেখল বুনো শুয়োরেরই যাওয়া উচিত — সে সকলের চেয়ে বয়সে বড়, তার সারা গায়ে প্রায় শেওলা জমে গেছে। কিন্তু যেই সে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে এগিয়ে গেল — যদিও রীতিমতো সম্ভ্রম দেখিয়েই — অমনি মোড়লগিন্নি হৈ হৈ করে তার ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠে তাকে এই বলে তাড়িয়ে দিল যে এ লোকটা ভদ্রতা ও শিষ্ট আচরণ কাকে বলে জানে না।

এবারে ভাল্লুকের ডাক পড়ল। ভল্লুক বাবাজী ত চলল, কিন্তু যেই সে অন্ধকার গর্তের মধ্যে দেখতে পেল আগুনের ভাঁটার মতো দুটো চোখ ইয়া গোঁফওয়ালা গোলাকার ভয়ঙ্কর মুখের ওপর জ্বলজ্বল করছে, তখন সে ঘাবড়ে গেল, কোন রকমে পায়ে খাড়া থেকে গোঁ গোঁ করে কী যেন বলল, নীচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে এলো।

'সরে যাও! সরে যাও!' খেঁকশিয়ালী হাঁক দিল। 'উনি নিজে আসছেন, নিজেই আসছেন!'

জন্তুজানোয়াররা সরে গিয়ে কেউ গাছের ওপরে, কেউ ঝোপঝাড়ের আড়ালে, কেউ বা গুঁড়ির আড়ালে — যে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়ল। মার্জারমশাই গুরুগম্ভীর চালে বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে খেঁকশিয়ালী ঠাকরুন তার কানে কানে বলে দিল সে যেন লেজটা যতদূর সম্ভব ওপরে তুলে ধরে বেশ করে শূন্যে ঝাপটায়। তারপর তার জন্য যে টেবিলটা তৈরি ছিল সে দিকে এগিয়ে এলো সে খাবার খেতে। এই সময় সে তার পুরনো অভ্যাসবশে গরগর করে উঠল: 'আউর লাও, আউর লাও!'

বলতে বলতে ভালুক যেখানে ঝোপের আড়াল থেকে তাদের এই অদ্ভুত মোড়লটিকে উঁকি মেরে দেখছিল সেখানে পাতার খসখস শব্দ শুনে আড়চোখে তাকিয়ে ইঁদুর আছে ভেবে মার্জারমশাই আর ধৈর্য ধরতে না পেরে এক লাফে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সব জন্তুজানোয়ার ভয়ে কাঠ হয়ে গেল, কারও তখন আর দাঁড়িয়ে থাকার মতো অবস্থা নেই — সকলেই ভাবছে তাদের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। লাফিয়ে উঠে সবাই ছুটতে শুরু করল, কেউ আর পিছু ফিরে তাকায় না। খেঁকশিয়ালী যেই বনে তার মোড়লকে নিয়ে থাকত সেই বনটা দেখতে দেখতে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। খেঁকশিয়ালী এখন নিশ্চিন্ত, দিব্যি আরাম তার, সে নিজের খুশি মতো শিকার করতে পারে।

এই ভাবে ধূর্ত খেঁকশিয়ালী একজনের পরিত্যক্ত একটা থুত্থুড়ে, অথর্ব বিড়ালকে নিজের কাছে রেখে তাকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে সব জন্তুজানোয়ারকে বন থেকে খেদিয়ে ছাড়ল।

কন্‌স্তান্তিন উশিন্‌স্কি

অন্ধ ঘোড়া

সে অনেক অনেক কাল আগেকার কথা। তখন আমরা ত ছিলামই না, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা, এমন কি তাদের বাবারাও জন্মান নি। সেই সময় সমুদ্রতীরে ছিল স্লাভ শহর ভিনেতা — সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র। আর এই শহরেই বাস করত অশেষবিত্ত নামে এক সদাগর। দামী দামী পণ্যদ্রব্যে বোঝাই হয়ে দূর দূর সমুদ্রে যাত্রা করত তার জাহাজ।

অশেষবিত্ত ছিল খুব ধনী, সে থাকতও বিলাসব্যসনের মধ্যে। অশেষবিত্ত নামটাও হয় সম্ভবত তার প্রচুর ধনসম্পদের জন্য, তাছাড়া তার বাড়িতে বলতে গেলে তখনকার আমলে

ভালো আর দামী দামী যা কিছু পাওয়া যেত সে সবই ছিল। আর বাড়ির কর্তা নিজে, তার গিন্নি ও ছেলেমেয়েরা খাওয়াদাওয়া করত কেবলই সোনারুপোর পাত্রে, পরত কেবল মেরু-নকুলের লোম আর জরির পোশাক।

অশেষবিত্তের ঘোড়াশালায় ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর ঘোড়া। কিন্তু না তার নিজের ঘোড়াশালায় না ভিনেতার আর কোথাও এমন একটিও ঘোড়া ছিল না যে অশেষবিত্তের 'বাতাসী' নামে ঘোড়ার চেয়ে তুরন্ত, তার চেয়েও সুন্দর। অশেষবিত্ত নিজের প্রিয় যে ঘোড়াটায় চড়ে যাতায়াত করত তাকে সে এই নাম দিয়েছিল পায়ের দ্রুত চলনের জন্য। মালিক নিজে ছাড়া আর কেউ এই বাতাসীর পিঠে চাপতে সাহস পেত না, আর মালিকও অন্য কোন ঘোড়ার পিঠে কখনও চাপত না।

একবার সদাগরকে বাণিজ্যের কাজে কোন এক জায়গা থেকে ভিনেতায় ফেরার পথে তার প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চেপে বিশাল এক অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, বনটা ছিল ভয়ানক অন্ধকার আর ঘন। বাতাসে দোল খাচ্ছে বিষণ্ণ দেবদারু গাছগুলোর মাথা। সদাগর সম্পূর্ণ একা, তার প্রিয় ঘোড়াটা দূর যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ায় সে ঘোড়া চালাচ্ছিল সাবধানে, খুবই আস্তে।

এমন সময় যেন ভুঁই ফুঁড়ে ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো ছয়জন তাগড়া জোয়ান। তাদের চোখমুখের চেহারা হিংস্র, মাথায় তাদের লোমশ টুপি, হাতে ত্রিশূল, কুড়ুল আর ছুরি। তিনজন ঘোড়ার পিঠে, তিনজন পদাতিক। দস্যুদের দু'জন ততক্ষণে সদাগরের ঘোড়ার লাগাম প্রায় ধরে ফেলেছে।

ধনী অশেষবিত্ত যদি তার বাতাসীর পিঠে না চেপে অন্য কোন ঘোড়ার পিঠে চাপত তাহলে আর তাকে তার জন্মভূমি ভিনেতার মুখ দেখতে হত না। লাগামে অন্যের হাতের ছোঁয়া টের পেয়ে ঘোড়া ঝটকা টানে সামনে এগিয়ে গেল, যে দু'জন দুর্বৃত্ত তার লাগাম ধরেছিল চওড়া, তেজী বুকের ধাক্কায় তাদের উলটে ফেলে দিল। তৃতীয় আরেকজন ত্রিশূল দোলাতে দোলাতে সামনে ছুটে এসে তার পথ আটকাতে এলে তাকে সে পায়ের তলায় দলল, তারপর ছুটে চলল ঘূর্ণিবায়ুর বেগে। দস্যুদের ঘোড়াগুলোও ভালো ছিল, কিন্তু অশেষবিত্তের ঘোড়ার নাগাল ধরবে এমন সাধ্য তাদের কোথায়!

বাতাসী ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও দস্যুরা পিছু ধাওয়া করছে টের পেয়ে শক্ত করে টানা ধনুকের ছিলা থেকে ছোঁড়া তীরের বেগে ছুটে চলল, ক্ষিপ্ত দুর্বৃত্তের দলকে অনেক পিছনে ফেলে।

আধঘণ্টা বাদে অশেষবিত্ত তার উত্তম ঘোড়ার পিঠে চেপে নিজের দেশ ভিনেতার ভেতরে চলে এলো। ঘোড়ার গা থেকে তখন চাপ চাপ ফেনা গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

ঘোড়ার পাঁজর ক্লান্তিতে ঘন ঘন ওঠা পড়া করছে। সদাগর ঘোড়া থেকে নেমে তক্ষুনি বাতাসীর ঘর্মাক্ত ঘাড় চাপড়ে গুরুগম্ভীর ভাবে শপথ করল তার যাই ঘটুক না কেন বিশ্বস্ত

ঘোড়াটাকে সে কখনও কারও কাছে বেচবে না, কাউকে দান করবে না, ঘোড়াটা যত বুড়োই হয়ে পড়ুক না কেন কখনও তাকে তাড়িয়ে দেবে না, আর রোজ, আমরণ তিন কুনকে করে সেরা জাতের যই তার জন্য বরাদ্দ থাকবে।

কিন্তু সদাগরের তাড়া ছিল তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কাছে যাবার। তাড়াতাড়িতে অশেষবিত্ত নিজে ঘোড়াটার দিকে নজর দিতে পারল না। এদিকে অলস সহিসেরাও অবসন্ন ঘোড়াকে ভালোমতো জিরোবার অবকাশ দিল না, তার গা পুরোপুরি জুড়ানোর আগেই তারা ওকে দানাপানি দিল।

তার পর থেকেই বাতাসী অসুখে পড়ল, দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল, তার পা দুর্বল হয়ে পড়ল, সে অন্ধ হয়ে গেল। সদাগরের খুবই দুঃখ হল, ছয়মাস সে তার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল: অন্ধ ঘোড়া আগের মতোই ঘোড়াশালায় দাঁড়িয়ে থাকত, রোজ তার জন্য বরাদ্দ থাকত তিন কুনকে করে যই।

পরে অশেষবিত্ত আরও একটা সওয়ারী ঘোড়া কিনল, ছয়মাস পরে তার মনে হল অন্ধ, অকর্মণ্য ঘোড়াকে তিন কুনকে করে যই দেওয়া স্রেফ বাজে খরচ; তাই সে বরাদ্দ করে দিল দু'কুনকে। আরও ছয় মাস কাটল। অন্ধ ঘোড়ার তখনও বয়স কম, অনেকক্ষণ ধরে তাকে খাওয়াতে হত, তাই তার জন্য এখন বরাদ্দ হয়ে গেল এক কুনকে। শেষকালে এটাও সদাগরের কাছে বেশি মনে হল, বাতাসী যাতে ঘোড়াশালায় খামোকা জায়গা জুড়ে না থাকে সেইজন্য সদাগর লাগাম খুলে তাকে ফটকের বার করে দেওয়ার হুকুম দিল। অন্ধ ঘোড়া গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুতেই যেতে চায় না দেখে সহিসেরা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে আঙ্গিনার বার করে দিল।

বেচারি অন্ধ বাতাসী তাকে নিয়ে ওরা কী করছে বুঝতে না পেরে, কোথায় যাবে দেখতে না পেরে, ঠিক করে উঠতে না পেরে মাথা নীচু করে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ ভাবে কান নাড়তে লাগল। রাত নেমে এলো, বরফ পড়তে শুরু করল। বেচারি অন্ধ ঘোড়ার পক্ষে রাস্তায় পাথরের ওপর ঘুমানো কঠিন, তাছাড়া ঠান্ডাও। কয়েক ঘণ্টা সে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, শেষকালে ক্ষুধার তাড়নায় সে খাবারের সন্ধান করতে বাধ্য হল। মাথা ওপরের দিকে তুলে, কোথাও অন্তত কোন পুরনো পড়ন্ত চালার এক গোছা খড় পাওয়া যায় কিনা গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার সন্ধান করতে করতে অন্ধ ঘোড়া এলোপাতাড়ি ঘুরতে লাগল —অনবরত ধাক্কা খেতে লাগল। কখনও বাড়ির কোনায় কখনও বা বেড়ার গায়ে।

তোমাদের জেনে রাখা ভালো যে অন্যান্য প্রাচীন স্লাভ শহরের মতো ভিনেতারও রাজা বলে কেউ ছিল না, শহরের অধিবাসীদের শাসনভার তাদের নিজেদের ওপরেই ছিল, কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে হলে তারা চত্বরে এসে জড় হত। জনসাধারণের নিজেদের

ব্যাপার সমাধানের জন্য, বিচার কিংবা শাস্তির জন্য এই ধরনের যে জনসমাবেশ তাকে বলা হত 'ভেচে'। চত্বরের মাঝখানে যেখানে ভেচে'র সমাবেশ হত সেখানে চারটে খুঁটির গায়ে ঝুলত ভেচে'র বিশাল ঘণ্টা। এই ঘণ্টার আওয়াজ শুনে জনসাধারণ এসে জড় হত এবং তাদের মধ্যে কেউ যদি তার প্রতি কোন অন্যায় হয়েছে মনে করে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচার ও সমর্থন দাবি করত তাহলে সে ঐ ঘণ্টা বাজাতে পারত। কেউই অবশ্য কোন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভেচে'র ঘণ্টা বাজাতে সাহস করত না, কেন না সকলেই জানত যে এর জন্য জনসাধারণের কাছে জোর নাকাল হতে হবে।

চত্বরের ওপর দিয়ে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে অন্ধ, বধির ও ক্ষুধার্ত ঘোড়াটা ঘটনাচক্রে ধাক্কা খেল সেই খুঁটিগুলোর গায়ে, যেখানে ঘণ্টা ঝুলছিল। সম্ভবত কোন ঢালু চালের কিনারা থেকে এক গাদা খড় টেনে বার করছে মনে মনে এই ধারণা করে সে ঘণ্টার জিভের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা দাঁতে চেপে ধরে টানতে লাগল: তখনও বেশ সকাল, কিন্তু ঘণ্টা এত জোরে বাজতে লাগল যে তা সত্ত্বেও লোকজন ভিড় করে ছুটে এসে জড় হল চত্বরে — তাদের জানতে বাসনা হল কে এত জোরে জনসাধারণের বিচার ও সমর্থন দাবি করছে। ভিনেতার সকলেই বাতাসীকে জানত, জানত যে সে তার প্রভুর প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার প্রভুর প্রতিশ্রুতিও তারা জানত — তাই চত্বরের মাঝখানে অন্ধ, ক্ষুধার্ত বেচারি ঘোড়াটাকে বরফে ঢাকা অবস্থায় ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

শিগগিরই আসল ঘটনাটা জানা গেল। লোকে যখন জানতে পারল যে ধনী সদাগর অশেষবিত্ত তার প্রাণ যে বাঁচিয়েছে অন্ধদশাগ্রস্ত সেই ঘোড়াটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তখন তারা একবাক্যে সিদ্ধান্ত নিল যে ভেচে'র ঘণ্টা বাজানোর পূর্ণ অধিকার বাতাসীর আছে।

অকৃতজ্ঞ সদাগরকে লোকে চত্বরে ডেকে পাঠাল; তার কৈফিয়তদানের চেষ্টা সত্ত্বেও তার ওপর আদেশ হল যে আগের মতো ঘোড়াটার ভরণপোষণের দায়িত্ব তাকে নিতে হবে এবং যতদিন ঘোড়াটা মারা না যায় ততদিন তাকে খাওয়াতে হবে। এই দণ্ড যাতে কার্যকরী হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য বিশেষ একজন লোক নিযুক্ত হল, আর যে দণ্ড তাকে দেওয়া হল তা পাথরের গায়ে খোদাই করে এই ঘটনার স্মৃতি হিশেবে ভেচে'র চত্বরে রেখে দেওয়া হল।

লেভ তলস্তয়

ন্যায়বিচারক

বাউয়াকাস নামে এক রাজা ছিলেন আলজিরিয়ায়। লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন তাঁর রাজ্যের কোন এক শহরে নাকি একজন ন্যায়বিচারক আছেন, যিনি সঙ্গে সঙ্গে সত্যি জেনে ফেলেন এবং কোন প্রতারকের নাকি সাধ্যি নেই তাঁর কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকে। কথাটা কতদূর সত্যি রাজার নিজের জানতে ইচ্ছে হল। বাউয়াকাস সদাগরের ছদ্মবেশ ধরে ঘোড়ায় চড়ে চললেন সেই শহরে যেখানে বিচারক বাস করেন। শহরে ঢোকার মুখে এক খোঁড়া বাউয়াকাসের কাছে এসে ভিক্ষা চাইল। বাউয়াকাস তাকে ভিক্ষা দিয়ে আরও এগিয়ে যাবেন এমন সময় সেই খোঁড়া তার পোশাক চেপে ধরল।

'কী চাই তোর?' বাউয়াকাস জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি কি তোকে ভিক্ষে দিই নি?'

খোঁড়া বলল, 'ভিক্ষে তুমি দিয়েছ বটে, কিন্তু আরও একটা উপকার করো — তোমার ঘোড়ায় চাপিয়ে আমাকে চত্বরটা পর্যন্ত নিয়ে যাও, নইলে ঘোড়া আর উটের দল আমাকে পিষেই মেরে ফেলবে।'

বাউয়াকাস খোঁড়াকে নিজের পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে চত্বর পর্যন্ত নিয়ে এলো। চত্বরে এসে তিনি ঘোড়া থামালেন। কিন্তু ভিখিরির নামার নাম নেই। বাউয়াকাস বললেন:

'কী হল? বসে আছ যে বড়? নেমে পড়, আমরা এসে গেছি।'

ভিখিরি বলল, 'নামব কেন? ঘোড়া ত আমার। ভালোয় ভালোয় যদি ঘোড়াটা না দিয়ে দাও তাহলে চল কাজীর কাছে।'

তাদের চারধারে লোকজনের ভিড় জমে গেল, ওদের তর্কবিতর্ক শুনে সকলেই চেঁচিয়ে বলল, 'কাজীর কাছে চলে যাও, উনি এর মীমাংসা করবেন!'

বাউয়াকাস আর খোঁড়া দু'জনে মিলে বিচারকের কাছে চলল। আদালতে লোকজন ছিল, বিচারক যাদের বিচার করছিলেন তাদের এক এক করে ডেকে পাঠাচ্ছিলেন।

বাউয়াকাসের পালা আসার আগে বিচারকের কাছে ডাক পড়ল এক পণ্ডিত আর এক চাষীর। তাদের বিবাদ বৌ নিয়ে। চাষী বলছিল এটা তার বৌ, এদিকে পণ্ডিত বলছিল তার বৌ। বিচারক তাদের কথা ভালো করে শোনার পর বললেন:

'মহিলাকে আমার এখানে রেখে যাও, তোমরা কাল এসো।'

তারা বেরিয়ে যাবার পর এসে ঢুকল এক কসাই আর এক কলু। কসাইয়ের সর্বাঙ্গে রক্ত আর কলুর সর্বাঙ্গে তেল। কসাইয়ের হাতে ছিল টাকা, কলু ধরে রেখেছিল কসাইয়ের হাত। কসাই বলল:

'আমি এই লোকটার কাছে তেল কিনি, তেল কিনে পয়সা দেবার জন্যে টাকার থলে খুলতেই সে আমার হাত চেপে ধরে, টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। আমরা তাই এসেছি তোমার কাছে — আমি হাতে ধরে রেখেছি টাকার থলি, আর ও ধরে রেখেছে আমার হাত। কিন্তু টাকাপয়সা আমার, ও একটা চোর।'

এদিকে কলু বলল:

'মিথ্যে কথা। কসাই আমার কাছে এসেছিল তেল কিনতে। আমি যখন ওকে কলসী ভরে তেল ঢেলে দিলাম তখন ও ওকে একটা মোহর ভাঙিয়ে দিতে বলল। আমি খুচরো টাকাপয়সা বার করে দোকানের গদির ওপর রেখেছি, এমন সময় ও সেগুলো তুলে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। আমি ওর হাত চেপে ধরে এখানে নিয়ে এসেছি।'

বিচারক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে পরে বললেন:

'টাকাপয়সাগুলো এখানে রেখে যাও তোমরা, কাল এসো।'

যখন বাউয়াকাস আর খোঁড়ার পালা এলো তখন বাউয়াকাস যা যা ঘটেছিল সব বললেন। বিচারক তাঁর কথা ভালো করে শোনার পর ভিখিরিকে তার বক্তব্য বলতে বললেন। ভিখিরি বলল:

'স্রেফ বাজে কথা। আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে শহরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই লোকটা মাটিতে বসে ছিল, আমাকে অনুরোধ করল তাকে ঘোড়ার পিঠে বয়ে নিয়ে যাবার। আমি ওকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে যেখানে নিয়ে যাবার সেখানে পৌঁছে দিলাম। কিন্তু ও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে চাইল না, বলল ঘোড়াটা নাকি ওর। ও মিথ্যে কথা বলছে।'

বিচারক একটু ভেবে বললেন, 'ঘোড়াটাকে আমার কাছে রেখে যাও, কাল এসো।'

পরের দিন বিচারক কী রায় দেন শোনার জন্য বহু লোকের ভিড় জমল।

প্রথম এগিয়ে এলো পণ্ডিত আর চাষী।

'তোমার বৌকে নিয়ে যাও,' বিচারক বললেন পণ্ডিতকে, 'আর চাষীটাকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারা হোক।'

পণ্ডিত তার বৌকে নিল, আর চাষীকেও সঙ্গে সঙ্গে সাজা দেওয়া হল।

তারপর বিচারক ডাকলেন কসাইকে।

'টাকা তোমার,' কসাইকে তিনি বললেন। তারপর কলুকে দেখিয়ে বললেন, 'একে পঞ্চাশ ঘা বেত মারা হোক।'

এরপর ডাক পড়ল বাউয়াকাস আর খোঁড়ার।

'তোমার ঘোড়া তুমি চিনতে পারবে ত?' বিচারক জিজ্ঞেস করলেন বাউয়াকাসকে।

'পারব।'

'আর তুমি?'

'আমিও পারব,' খোঁড়া বলল।

'আমার পেছন পেছন এসো,' বাউয়াকাসকে বললেন বিচারক।

ওরা ঘোড়াশালায় এলো। বাউয়াকাস তৎক্ষণাৎ আরও বিশটা ঘোড়ার মধ্যে নিজের ঘোড়াটা দেখিয়ে দিল।

তারপর বিচারক খোঁড়াকে ঘোড়াশালায় ডাকলেন, তাকে কোন্‌টা তার ঘোড়া দেখিয়ে দিতে বললেন। খোঁড়া ঘোড়াটাকে চিনতে পেরে দেখিয়ে দিল। তখন বিচারক তার আসনে এসে বসলেন, বাউয়াকাসকে বললেন:

'ঘোড়া তোমার — নিয়ে যাও। খোঁড়াটাকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারা হোক।'

বিচারের পর বিচারক বাড়ির দিকে চলেছেন, বাউয়াকাসও চললেন তার পেছন পেছন।

'কী ব্যাপার? আমার বিচারে কি সন্তুষ্ট হও নি?' বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

'না, আমি সন্তুষ্ট,' বাউয়াকাস বলল, 'তবে জানতে চাই কী করে তুমি বুঝতে পারলে যে বৌ চাষীর নয়, পণ্ডিতের, টাকা কলুর নয়, কসাইয়ের, আর ঘোড়া ভিখিরির নয়, আমার?'

'স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে আমি জানতে পারি এই ভাবে: সকালে তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালাম, বললাম আমার দোয়াতে কালি ভরে দিতে। তখন সে দোয়াত নিয়ে তাড়াতাড়ি, দক্ষ হাতে সেটা ধুলো, তারপর কালি ভরল। তাতে বুঝতে পারলাম এ কাজে তার অভ্যেস আছে। চাষীর বৌ হলে এটা তার পক্ষে করা সম্ভব হত না। তার মানে পণ্ডিতের কথাই সত্যি। টাকা কার জানতে পারলাম এই ভাবে: একটা বাটির ভেতরে জল ঢেলে তাতে টাকাগুলো রাখলাম, আজ সকালে তাকিয়ে দেখলাম জলের ওপর তেল ভেসে উঠছে কিনা। টাকা কলুর হলে তার হাতের তেল থেকে ওগুলোতেও তেল লেগে যেত। জলের ওপরে তেল ছিল না, অতএব বুঝলাম কসাই সত্যি কথা বলছে। ঘোড়ার সম্পর্কে জানা কিন্তু খানিকটা কঠিন ছিল। খোঁড়াও তোমার মতোই বিশটা ঘোড়ার মধ্যে তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটা দেখিয়ে দিল। তবে হ্যাঁ, তোমরা ঘোড়াটাকে চিনতে পার কিনা সেটা দেখার জন্য আমি তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে ঘোড়াশালায় নিয়ে আসি নি, আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের দু'জনের মধ্যে কাকে ঘোড়া চিনতে পারে সেটা দেখা। তুমি যখন ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেলে তখন সে ঘাড় ফিরিয়ে তোমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু খোঁড়া যখন তাকে স্পর্শ করল তখন সে কানদুটো গুটাল, পা তুলল। তা থেকেই আমি জানতে পারলাম তুমিই হলে ঘোড়ার আসল মালিক।'

তখন বাউয়াকাস বললেন:

'আমি সদাগর নই, আমি রাজা বাউয়াকাস। আমি এখানে এসেছি লোকে তোমার সম্পর্কে যা বলে তা সত্যি কিনা দেখার জন্য। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি বিজ্ঞ বিচারকই বটে। আমার কাছে কী চাও বল, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব।'

বিচারক বললেন, 'কোন পুরস্কার আমার দরকার নেই।'

ভ্‌সেভলোদ গারশিন

ব্যাঙের বিশ্বদর্শন

কোনো কালে এক-যে ছিল ব্যাঙ। ব্যাঙ বাস করত জলায়, ধরে-ধরে খেত পোকামাকড় আর মশা আর বসন্তকাল এলেই জাতভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সজোরে ডাক ছাড়ত ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ। ব্যাঙ হয়তো ওই জলাতেই তার গোটা জীবনটা সুখে কাটিয়ে দিত — অবিশ্যি যদি-না কোনো সারসপাখি তাকে একদিন কপ্‌ করে খেয়ে ফেলত। কিন্তু হল কী, একদিন এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে তার ফলে তার জীবনের ধারাই গেল ওলটপালট হয়ে।

একদিন জল থেকে উঁচিয়ে-থাকা একটা খোঁটার ওপর বসে ছিল ব্যাঙ, আর বসে-বসে মহা আরামে হালকা বৃষ্টিতে ওম্‌ পোহাচ্ছিল।

ভাবছিল: 'আহ্, কী চমৎকার বিষ্টিভেজা দিনটা! বেঁচে থাকার কতই-না মজা!'

বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে-ঝরে পড়ছিল তার চক্কর-কাটা চকচকে পিঠের ওপর, আর তারপর ফোঁটাগুলো গড়িয়ে নামছিল তার পেটের নিচে আর পেছনের পা-দুখানার পেছনে। এত আরাম লাগছিল তার যে সে আনন্দে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে ডেকে উঠেছিল আর-কি, কিন্তু ভাগ্যি ভালো যে সময়মাফিক তার মনে পড়ে গেল সময়টা হচ্ছে হেমন্ত আর ব্যাঙেরা হেমন্তকালে ডাকে না, তাদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ ডাক ছাড়ার ঋতু হচ্ছে বসন্ত। কাজেই সময়মতো সামলে গিয়ে সে ডাকটা গিলে ফেলল আর নিঃশব্দে বসে-বসে ওম্ পোহাতে লাগল।

হঠাৎ মাথার ওপর অনেক উঁচুতে হালকা, কাটা-কাটা শিস্ টানার একটা আওয়াজ কানে এল ব্যাঙের। আকাশে তখন একঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছিল, আর তাদের ডানার ঘায়ে বাতাস কেটে যাওয়ার সময় অমন একটা গানের, কিংবা বলা যায় শিস্ দেয়ার, আওয়াজ উঠছিল। হাঁসেরা সাধারণত আকাশের এত ওপর দিয়ে ওড়ে যে খালিচোখে তাদের প্রায় দেখাই যায় না, কেবল ওই শিসের শব্দ শুনে বোঝা যায় যে হাঁসের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। ওইদিন অবিশ্যি হাঁসের ঝাঁকটা নিচে নেমে এসেছিল আর শূন্যে প্রকাণ্ড একটা অর্ধবৃত্তের আকারে এক-চক্কর ঘুরপাক খেয়ে ঝাঁকটা এসে নামল ঠিক ওই জলার জলেই যেখানে ছিল ব্যাঙের বাসা।

ঝাঁকের একটা হাঁস হেঁকে বললে, 'প্যাঁক-প্যাঁক! আমাদের এখনও বহুত দূর পাড়ি দিতে হবে হে। এস, এখানে বরং কিছুমিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

কথাটা শুনেই ব্যাঙ তাড়াতাড়ি ঝুপ করে জলে পড়ে লুকোল। সে অবিশ্যি জানত যে হাঁসেরা তার মতো প্রকাণ্ড আর মোটাসোটা কোলা ব্যাঙকে খাবে না, তবু সাবধানের মার নেই ভেবে সে ডুব দিল খোঁটার নিচে।

কিন্তু হাঁসেরা কোথায় যাচ্ছে এটা জানার জন্যে তার এমন আকুলিবিকুলি জাগল যে সবদিক ভেবেচিন্তে সে সাহস করে ড্যাবডেবে দুটো চোখওয়ালা তার মুখখানা জলের ওপর ভাসিয়ে তুলল।

ঠিক তক্ষুনি সে শুনতে পেল আরেকটা হাঁস বলছে, 'প্যাঁক-প্যাঁক! ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে হে। আমাদের তাড়াতাড়ি দক্ষিণে যেতে হবে হে, দক্ষিণে যেতে হবে!'

আর এটা শোনামাত্র বাকি সব হাঁস সম্মতি জানিয়ে সজোরে প্যাঁক-প্যাঁক ডাক ছাড়তে শুরু করে দিল।

ব্যাঙ এবার ভয়ে-ভয়ে বলে উঠল, 'আপনাদের কথায় বাধা দিচ্ছি বলে মার্জনা করবেন। কিন্তু ওই-যে বললেন দক্ষিণে যাবার জন্যে আপনারা এত তাড়াহুড়ো করছেন, তা সে-জায়গাটা কোথায়?'

ওর কথা শুনে হাঁসেরা ভিড় করে এলো ব্যাঙের চারিধারে। ওকে দেখে প্রথমেই তাদের মাথায় যে-চিন্তাটা জেগেছিল তা হল কপ্ করে একগ্রাসে ওকে খেয়ে ফেলা, কিন্তু পরে তাদের

প্রত্যেকেই ভেবে দেখল যে, না, ব্যাঙটা সত্যিই প্রকাণ্ড বড়, ওকে গিললে গলায় বেধে যাবে হয়তো। এরপর হাঁসেরা সবাই ডানা ঝাপটে-ঝাপটে একসঙ্গে তারস্বরে বলতে লাগল:

'ওহ্, দক্ষিণ জায়গাটা ভারি চমৎকার! ওখানে এখন গরম। আর কী সুন্দর উষ্ণ জলের বিল আছে ওখানে! আর আছে মোটা-মোটা, পুরুষ্টু সব কেঁচো! ওহ্, কী চমৎকার জায়গা দক্ষিণ-দেশটা!'

হাঁসেদের উত্তেজিত এই চ্যাঁচামেচিতে কানে প্রায় তালা ধরে গেল ব্যাঙের। সে অনেক কাকুতিমিনতি করে তবে তাদের চুপ করাল, তারপর অন্যদের চেয়ে যার বেশি জ্ঞানগম্যি আছে বলে মনে হল এমন ভারিক্কিগোছের একটি হাঁসকে মিনতি জানিয়ে বলতে বলল দক্ষিণ ব্যাপারটা কী।

হাঁসটি যখন সব কথা খুলে বলল তাকে তখন অবিশ্যি ব্যাঙের মনে হল যে জায়গাটা সত্যিই আজব রকমের বটে। কিন্তু আমাদের ব্যাঙ ছিল ভারি সতর্ক, সাবধান, তাই আরও সঠিক খবর জানার জন্যে সে শুধোল:

'ওখানে পোকামাকড় আর মশা পাওয়া যায় কি?'

'তা আর বলতে? পাওয়া যায় একেবারে ঝাঁকে-ঝাঁকে!' জবাব দিল জ্ঞানী হাঁসটি।

শুনেই ব্যাঙ ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে ডেকে উঠল। তারপরই তাড়াতাড়ি চারিদিক তাকিয়ে দেখল হেমন্তকালে ডাক ছাড়তে ওর বন্ধুরা ওকে শুনে ফেলল কিনা। কিন্তু একবারের জন্যে হলেও এমন আজব কথা শুনে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ ডাক না-ছেড়ে উপায় কী! হাঁসেদের এবার ও মিনতি জানিয়ে বলল, 'আমাকেও আপনাদের সঙ্গে নিন-না কেন!'

'কথা বললে বটে একখানা!' অবাক হয়ে জ্ঞানী হাঁসটি জবাব দিল। 'তোমাকে সঙ্গে নেব কী করে? তোমার কী ডানা আছে?'

ব্যাঙ শুধোল, 'আপনারা রওনা দিচ্ছেন কবে?'

'শিগ্গির, খুব শিগ্গির,' একসঙ্গে হেঁকে বললে সবক'টা হাঁস। 'প্যাঁক-প্যাঁক, প্যাঁক-প্যাঁক! ভারি ঠাণ্ডা এখানে। শিগ্গির আমাদের পাড়ি দিতে হবে দক্ষিণে, দক্ষিণে, দক্ষিণে!'

'আমাকে মিনিট-পাঁচেক সময় দেবেন কি?' মিনতি জানিয়ে বলল ব্যাঙ। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব আমি, আর যাওয়ার উপায় একটা-কিছু মাথা থেকে বের করে ফেলবই ফেলব।'

যে-খোঁটার আগায় ফের উঠে বসেছিল তা থেকে ঝুপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল ব্যাঙ, তারপর জলার নিচেকার কাদার মধ্যে এমনভাবে সেঁধিয়ে গেল আর মাটিচাপা হয়ে রইল যাতে তার চিন্তায় কেউ বিঘ্ন ঘটাতে না-পারে। এদিকে পাঁচ মিনিট কেটে গেল আর হাঁসেরাও ওড়বার জন্যে প্রস্তুত হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে খোঁটার কাছে জলের মধ্যে ভুশ করে ভেসে উঠল ব্যাঙ। ব্যাঙের মুখ আনন্দে যতখানি ঝলমল করতে পারে ওর মুখও ততখানি ঝলমল করে উঠেছে তখন।

ব্যাঙ চেঁচিয়ে বলল, 'পেয়েছি! পেয়েছি! মাথা খাটিয়ে উপায় বের করেছি একটা! আপনাদের যে-কোনো দু'জন ঠোঁটে করে গাছের একটা ছোট ডাল ঝুলিয়ে নিন আর আমি সেই ডালের মাঝখান থেকে ঝুলে থাকি। আপনারা উড়বেন আর ডালে করে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবেন। কেবল একটা কথা — আপনাদের প্যাঁক-প্যাঁক আর আমার ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ ডাকা চলবে না।'

ব্যাঙ হালকা প্রাণী হলেও হাজার-হাজার মাইল তাকে ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আর একবারের জন্যেও প্যাঁক-প্যাঁক করে না-ডাকাটা বড় খেলাকথা নয়, তবু ব্যাঙের এত বুদ্ধি দেখে হাঁসেরা এমনই খুশি হয়ে উঠল যে এ-প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। ঠিক হল, প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর হাঁসেরা ঠোঁট-বদল করবে, আর যেহেতু ব্যাঙ মাত্র একটা ও তারা এতগুলি প্রাণী সেইহেতু একেক জনের পালা তেমন ঘনঘন আসবে না। ভালো আর শক্ত দেখে ছোট একটা গাছের ডাল যোগাড় করে দুটো হাঁস সেই মুখ ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল আর ব্যাঙ ঝুলে রইল ডালের মাঝখানটা কামড়ে। এইভাবে হাঁসের গোটা ঝাঁকটা উড়াল দিল।

হাঁসেরা তাকে অত ভয়ংকর উঁচুতে তোলায় ব্যাঙের তো প্রথমে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। তাছাড়া যে-দুটো হাঁস ডালটা ঠোঁটে ধরে ছিল তারা ঠিকমতো পাশাপাশি থেকে না-ওড়ায় ডালটায় ঝাঁকুনি লাগছিল খুব। এতে বেচারা ব্যাঙ শূন্যে দুলতে লাগল কাগজের তৈরি সঙ-পুতুলের মতো। পাছে মুখ থেকে ডালটা খসে যায় আর সে আছড়ে পড়ে অনেক নিচে মাটির ওপর — এই ভয়ে ব্যাঙ প্রাণপণে চোয়ালদুটো শক্ত করে কামড়ে রইল ডালখানা। এত অসুবিধে সত্ত্বেও ব্যাঙ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ত্রিশঙ্কুর মতো এই ঝুলে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল, আর ইতিউতি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল। ডাল কামড়ে ঝুলে থাকায় তার নিচ দিয়ে ঝড়ের বেগে যে-সমস্ত খেতখামার, মাঠঘাট, নদী আর পাহাড় পিছলে পেছনে চলে যাচ্ছিল তেমন ভালো করে সে-সব অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছিল না সে, তবু ঘাড় ঘুরিয়ে মাঝেমাঝে পেছন দিকে এক-আধটুকু যা দেখছিল তাতেই তার অহংকার আর সুখের সীমা ছিল না।

'বুদ্ধি খাটিয়ে কেমন একটা আজব কান্ড ঘটিয়েছি আমি!' মনে মনে সে ভাবছিল।

যে-হাঁসের জোড়াটা ব্যাঙকে বয়ে নিয়ে চলেছিল তাদের পেছনে পেছনে উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁক ইতিমধ্যে শতমুখে গুণকীর্তন জুড়ে দিয়েছিল ব্যাঙের।

তারা বলছিল, 'সত্যি, আমাদের ব্যাঙভায়ার মাথা আছে বটে একখানা!.. এমন মাথা আমাদের হাঁসেদের মধ্যেই-বা কটা দেখা যায় বল দেখি?'

ব্যাঙের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের ধন্যবাদ দেয়, কিন্তু মুখ খুললেই ওই সাঙ্ঘাতিক উঁচু থেকে পড়ে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে এ-কথাটা সময়মতো মনে পড়ায় আরও জোরে চোয়ালদুটো দিয়ে ডালটা চেপে ধরে মুখ বুজে রইল সে। এইভাবে সারা দিন সে শূন্যে দুলতে-দুলতে চলল। উড়ন্ত অবস্থাতেই হাঁসেরা ঠোঁট-বদল করতে লাগল, আগের জোড়া পরের জোড়ার ঠোঁটে কায়দাদুরস্তভাবে ডালখানা চালান করে দিতে লাগল, তবু সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল এমন সাঙ্ঘাতিক

ভয়জাগানে যে থেকে-থেকেই ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে ডেকে ওঠবার উপক্রম করছিল ব্যাঙ। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সাহসের পরিচয় দিতে হচ্ছিল তাকে আর সে-যে সাহসী ছিল না তা-ও তো নয়। সেদিন সন্ধেবেলা অজানা একটা জলায় রাতের জন্যে আস্তানা গাড়ল হাঁসের ঝাঁকটা। পরদিন সকালে ফের উড়াল দিল তারা, তবে এবার পিঠ আর মাথা সামনের দিকে আর পেটটা পেছন দিক করে ঝুলে রইল ব্যাঙ, যাতে সে নিচের দৃশ্য আগের চেয়ে ভালো করে দেখতে পারে। হাঁসেরা উড়ে চলল যত-সব ফসল-কাটা মাঠ, হলুদ-হয়ে-আসা বন আর কাটা-ফসল গাদা-দিয়ে-রাখা গ্রামের ওপর দিয়ে। ওদের কানে আসছিল নিচে মানুষজনের কথাবার্তা আর লম্বা-লম্বা ল্যাঠি দিয়ে জোয়ার-দানা আছড়ানোর আওয়াজ। অনেক লোক আবার মাথা তুলে হাঁসের ঝাঁকটাকে দেখতে লাগল আর ঝাঁকটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু-একটা লক্ষ্য করে একে-অপরকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে লাগল কী-যেন। ব্যাঙের তখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল মাটির আরও কাছ দিয়ে উড়ে যায়, যাতে লোকে তাকে দেখতে পায় আর তার সম্বন্ধে লোকে কী বলছে তা শুনতে পায় সে। এরপর যখন তারা রাতের জন্যে থামল তখন সে হাঁসেদের বলল:

'আচ্ছা, আমরা কি আরেকটু নিচু দিয়ে উড়ে যেতে পারি না? উঁচু দিয়ে গেলে আমার কেমন মাথা ঘোরে আর ভয় হঠাৎ শরীর কেমন করলে যদি নিচে পড়ে যাই।'

দয়ালু হাঁসেরা কথা দিল যে এরপর তারা আর অত উঁচু দিয়ে উড়বে না। পরদিন তারা এত নিচু দিয়ে উড়তে লাগল যে নিচের লোকে কী বলাবলি করছে তা পর্যন্ত কানে এলো তাদের।

তারা শুনল একটা গ্রামের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচামেচি করে বলছে, 'এই দ্যাখ্, দ্যাখ্ — হাঁসেরা কেমন একটা ব্যাঙকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে!'

কথাটা শুনে ব্যাঙ তো আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল।

এরপর পরের গ্রামের বয়স্করা পর্যন্ত চেঁচিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ্, দ্যাখ্! এমন কাণ্ড দেখেছিস কোনো জন্মে?'

ব্যাঙ ভাবল: 'এমন আজব বুদ্ধিটা-যে হাঁসেদের নয়, আমারই মাথা থেকে বেরিয়েছে — তা যদি ওরা জানত!'

তৃতীয় একটা গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় সেখানকার লোকরা চেঁচিয়ে বলল, 'দেখেছিস কাণ্ড! এমন বুদ্ধি বিশ্বদুনিয়ায় কার মাথা থেকে বেরোতে পারত বল্ দেখি?'

নাঃ, আর সহ্য করা যায় না! এত প্রশংসায় বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল ব্যাঙের। সব সতর্কতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সে এবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললে:

'আমিই এটা মাথা খাটিয়ে বের করেছি! আমি! আমিই!'

আর এই চ্যাঁচানির সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে নিচের দিকে পড়তে লাগল সে। হাঁসের ঝাঁক ভয়ে চিৎকার করে উঠল; একটি হাঁস উড়ে নেমে এসে মাঝপথে ব্যাঙকে লুফে নেবার চেষ্টা পর্যন্ত করল কিন্তু পারল না। চারখানা ঠ্যাঙ লটপট করতে করতে ব্যাঙ-বাবাজি নিচে পড়তে লাগল

সজোরে। কিন্তু হাঁসেরা তাকে ডালে ঝুলিয়ে খুব তাড়াতাড়ি উড়ে যাচ্ছিল বলে সে যেখানটায় চ্যাঁচানি শুরু করেছিল সরাসরি তার নিচে শক্ত পাথুরে রাস্তার ওপর এসে পড়ল না, পড়ল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গাঁ-খানার একটা প্রান্তে পোঁছে। আর কী ভাগ্যি, পড়বি তো পড় একেবারে প্রকান্ড একটা নোংরা পুকুরের জলে ঝুপ করে!

জলে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে জলের ওপর মাথা উঁচিয়ে উঠল সে, আর উত্তেজিতভাবে গলা ফাটিয়ে সেখান থেকেই চ্যাঁচাতে লাগল, 'এ-বুদ্ধি আমার, আমার, আর কারও নয়!'

কিন্তু একথা শোনার লোক ছিল না কেউ ধারেকাছে। পুকুরের জলে প্রচন্ড তোলপাড় তুলে কী-একটা এসে পড়ায় পুকুরটির বাসিন্দা-ব্যাঙেরা ভয় পেয়ে জলের নিচে গিয়ে লুকিয়েছিল। এবার তারা একে-একে ভেসে উঠতে লাগল আর মহা আতঙ্কে সবাই তাকিয়ে রইল এই আগন্তুকের দিকে।

আমাদের ব্যাঙ-বাবাজি ওদের সাতখানা করে গল্প বলতে লাগল — কীভাবে সারা জীবন ধরে ভেবে-ভেবে অবশেষে দেশভ্রমণের কেমন একটা অভিনব, অত্যাশ্চর্য উপায় সে আবিষ্কার করেছে। অন্য ব্যাঙেদের সে বোঝাল তার একঝাঁক পোষা হাঁস আছে আর যখনই সে দেশভ্রমণ করতে চেয়েছে তখনই তারা তাকে বয়ে নিয়ে গেছে। সে এমনকি দক্ষিণের দেশেও গেছে, আর সেই রূপকথার দেশ কত-যে সুন্দর কী বলি! সেখানে আছে মনোরম সব উষ্ণ জলের জলা, আর তাতে আছে ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকামাকড় — সুস্বাদু কত রকমের-যে পোকা তার ইয়ত্তা নেই।

অবশেষে সে বলল, 'তোরা সব কেমন আছিস তাই দেখতে এখানে এলাম আমি। বসন্তকাল পর্যন্ত তোদের সঙ্গে এখানেই থাকব, যতদিন-না আমার পোষা হাঁসেরা আমায় নিতে আসে। ওদের আমি চরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়েছি, বুঝলি তো!'

কিন্তু ব্যাঙের 'পোষা হাঁসেরা' আর ফিরল না। তারা ভেবেছিল ব্যাঙ নিশ্চয়ই সেই শক্ত পাথুরে রাস্তায় আছড়ে পড়ে মরেছে, আর বেচারার এই করুণ পরিণতির কথা ভেবে ভারি দুঃখ পেয়েছিল তারা।

দ্মিত্রি মামিন-সিবিরিয়াক

ধূসরকণ্ঠী

১

শরতের প্রথম ঠাণ্ডায় ঘাস হলুদ হয়ে যেতে পাখিদের সকলের মধ্যে খুব দুশ্চিন্তা দেখা দিল। সকলে দূর পথযাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগল, সকলেরই চেহারা বিমর্ষ, গম্ভীর। কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া ত আর সহজ ব্যাপার নয়! কত হতভাগ্য পাখিই না মাঝপথে শক্তি হারিয়ে ফেলবে, কত পাখিই না নানা দুর্ঘটনায় মারা পড়বে! — মোটের ওপর, এটা চিন্তার কথা ত বটেই।

গম্ভীর প্রকৃতির বড় বড় পাখিরা — রাজহাঁস ও পাতিহাঁসের দল আসন্ন যাত্রার সমস্ত বাধাবিঘ্নের কথা চিন্তা করে গুরুগম্ভীর চালে পথে নামার জন্য তৈরি হতে লাগল।

সকলের চেয়ে বেশি চিৎকার চেঁচামেচি, ছটফটানি ও ব্যস্ততা দেখাতে শুরু করল পাতিহাঁস, ডাহুক, পানকৌড়ি, ছাতার — এই রকম সব ছোট ছোট পাখিরা। তারা অনেক আগেই ঝাঁক বেঁধে জড় হয়েছে, চড়া আর জলার ওপর দিয়ে এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে এত দ্রুত ওড়াউড়ি করছে যে দেখে মনে হয় কেউ যেন এক মুঠো মটরদানা ছড়িয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট পাখিরা বেশ বড় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বন এখন অন্ধকার, নীরব, কেননা বড় বড় গাইয়ে যারা ছিল তারা ঠান্ডা পড়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করে না থেকে উড়ে চলে গেছে।

'এই খুদেগুলোর এত ব্যস্ততা কেন!' বিড়বিড় করে বলল বুড়ো বালিহাঁস। নিজেকে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করে তোলা সে পছন্দ করে না, তাই বলল, 'যথা সময়ে সবাই উড়ব। এখানে ব্যস্ততার কী আছে বুঝতে পারছি না।'

তার বৌ বুড়ি হাঁস তাকে বলল, 'তুমি বরাবরই কুঁড়ে, তাই অন্যদের ব্যস্ততা তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না।'

'আমি কখনও কুঁড়েমি করেছি? আমার ওপর এ নেহাৎই অন্যায় তোমার — এছাড়া আর কী বলার আছে? এমনও ত হতে পারে যে আমি সকলের চেয়ে বেশি চিন্তা করি, কিন্তু বাইরে তা দেখাই না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যদি পাড়ে ছুটোছুটি করি, কিচিরমিচির করি, অন্যদের ব্যাঘাত ঘটাই, বিরক্তি ধরিয়ে দিই তাতে লাভ খুবই কম।'

হাঁস-গিন্নি তার স্বামীর ওপর অমনিতেই প্রসন্ন ছিল না, এখন সে সত্যি সত্যিই রেগে গেল।

'ওরে কুঁড়ের বাদশা, অন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ না! ওই দেখ, আমাদের ঐ পড়শী বুনো হাঁস কিংবা রাজহাঁসদের দিকে চেয়েই দেখ না — ওদের দেখেও সুখ! কেমন মিলেমিশে আছে। আমি হলফ করে বলতে পারি বুনো হাঁস বা রাজহাঁস নিজের বাসা কখনও ছাড়ে না, সব সময় ছানাপোনাদের আগে আগে চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আর তুমি? — বাচ্চাদের কথা ভাবার সময় কোথায় তোমার? কেবল নিজের কথাই ভাব, নিজের পেটটা পুরলেই হল। এক কথায়, কুঁড়ের বাদশা। তোমার দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে!'

'বকবক করিস নে, বুড়ি! তোমার স্বভাবটাও যে মধুর কিছু নয় তার জন্য ত আমি কোন কথা বলছি না। দোষত্রুটি অমন সকলেরই ধরা যায়। বুনো হাঁস যে অমন মূর্খ পাখি আর তাই নিজের ছানাপোনাদের পরিচর্যা করে তার জন্যে ত আর আমি দোষী নই! মোটকথা, আমার নিয়ম হল অন্যের ব্যাপারে নাক না গলান। কী দরকার? যে যার আপন মনে থাকুক না কেন।'

বুড়ো হাঁস ভারী ভারী যুক্তিতর্ক ভালোবাসত, আর সব সময় কোন না কোন রকমে যুক্তিতর্কের মোড় এমন ঘুরিয়ে দিত যে দেখা যেত সেই ঠিক, বুদ্ধিমান, সব সময়ই আর সবার

চেয়ে ভালো। বুড়ি বহুকাল হল এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অন্য, বিশেষ এক কারণে সে বিচলিত।

'কী রকম বাপ তুমি শুনি?' স্বামীর ওপর সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। 'বাপেরা ছেলেমেয়েদের যত্ন নেয়, কিন্তু তুমি একেবারেই নির্বিকার!'

'তুমি আমাদের ধূসরকণ্ঠীর কথা বলছ ত? ও যদি উড়তে না পারে ত আমার কী করার আছে বল? দোষ আমার নয়।'

ধূসরকণ্ঠী নাম তারা দিয়েছিল তাদের পঙ্গু মেয়েটাকে। বসন্তকালে খেঁকশিয়ালী ওদের বাসায় গুড়ি মেরে উঠে হাঁসের বাচ্চা ধরে — তখনই ধূসরকণ্ঠীর ডানা ভাঙে। বুড়ি হাঁস সাহস করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে, কিন্তু বাচ্চার একটা ডানা ভেঙে যায়।

'ভাবতেও বুক কাঁপে কী করে ধূসরকণ্ঠীকে আমরা এখানে ছেড়ে চলে যাব,' হাঁস-গিন্নি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল। 'সবাই উড়ে চলে যাবে, আর ও কিনা এখানে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকবে! একেবারে একা। আমরা দক্ষিণে গরমের দেশে উঠে যাব, আর ও বেচারি এখানে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে! ও যে আমাদেরই মেয়ে গো! ওঃ কী ভালোই আমি ওকে ভালোবাসি, আমার ধূসরকণ্ঠীকে! তাহলে তোমাকে বলি বুড়োকর্তা, আমি ওর সঙ্গে এখানে শীত কাটাব।'

'অন্য ছেলেমেয়েদের কী হবে?'

'ওরা সুস্থ সবল, আমাকে ছাড়াও চালিয়ে নিতে পারবে।'

ধূসরকণ্ঠীর প্রসঙ্গ উঠলেই বুড়ো হাঁস সব সময় কথার মোড় ঘুরানোর চেষ্টা করত। অবশ্য সে নিজেও ধূসরকণ্ঠীকে ভালোবাসত, কিন্তু নিজেকে মিছিমিছি ব্যতিব্যস্ত করে তোলা কেন? ও এখানে থেকে ঠাণ্ডায় জমে যাবে একথা ভাবলে অবশ্যই কষ্ট লাগে, কিন্তু কিছুই যে আর করার নেই। তাছাড়া অন্য ছেলেমেয়েদের কথাও ত ভাবতে হয়। গিন্নি সব সময় উদ্বিগ্ন, কিন্তু ঘটনাকে সোজাসুজি দেখা উচিত। বুড়ো হাঁস মনে মনে গিন্নির জন্য দুঃখ পেল, কিন্তু তার মাতৃহৃদয়ের শোক সে পুরোপুরি বুঝতে পারল না। তাহলে ত তখন খেঁকশিয়ালী ধূসরকণ্ঠীকে একেবারে খেয়ে ফেললেই ভালো হত, কেন না অমনিতেই শীতে তাকে মরতে হচ্ছে।

২

বুড়ি হাঁস আসন্ন বিচ্ছেদের কারণে তার পঙ্গু মেয়ের ওপর দ্বিগুণ দরদ দেখাতে লাগল। বেচারি ধূসরকণ্ঠী বিচ্ছেদ ও একাকীত্ব কাকে বলে তখনও ভালো করে জানত না, একজন অনভিজ্ঞ, আনাড়ির পক্ষে যেমন সম্ভব সেই রকম কৌতূহল নিয়ে সে অন্যদের পথযাত্রার আয়োজন লক্ষ করছিল। সত্যি বটে, তার ভাইবোনরা যে এমন ফুর্তি করে যাত্রার

আয়োজন করছে, তারা যে থাকতে পারবে দূরে বহু দূরে কোন এক জায়গায় যেখানে শীত নেই, একথা ভেবে তার মাঝে মাঝে হিংসা হত।

'তোমরা বসন্তকালে ফিরে আসবে ত?' ধূসরকণ্ঠী তার মাকে জিজ্ঞেস করল।

'আসব রে, আসব। ফের আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব।'

ধূসরকণ্ঠী ইতিমধ্যেই চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মা তাকে এমন কতকগুলো ঘটনার কথা বলল যেখানে হাঁসেরা শীতের সময় জায়গা ছেড়ে যায় নি। ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজে এমন দুই দম্পতিকে জানত।

বুড়ি হাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কোন রকমে ঠিক চালিয়ে নিবি রে। প্রথম প্রথম একা একা লাগবে, পরে অভ্যেস হয়ে যাবে। গরমজলের ঝরনা শীতকালেও জমে যায় না, তোকে যদি সেখানে নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে খুবই ভালো হত। জায়গাটা এখান থেকে দূরেও নয়। কিন্তু সে কথা আর খামোকা বলা কেন, তোকে ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া কোন মতেই আমাদের সাধ্যি নয়!'

'আমি সব সময় তোমাদের কথা ভাবতে থাকব,' বেচারি ধূসরকণ্ঠী বারবার বলতে লাগল। 'কেবলই ভাবব তোমরা কোথায় আছ, কী করছ, ফুর্তিতে আছ কি না। যাই বল না কেন, মনে করো আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি।'

বুড়ি হাঁসকে অনেক কষ্টে মনের দুঃখ চাপতে হল, বাইরে তা প্রকাশ করতে দিল না। সে বাইরে খুশির ভাব দেখানোর চেষ্টা করত, সকলের আড়ালে নীরবে কাঁদত। কী দুঃখই না তার হচ্ছে আদরের, বেচারি ধূসরকণ্ঠীর জন্য! অন্য ছেলেমেয়েদের এখন সে প্রায় লক্ষই করে না, তাদের দিকে মনোযোগও দেয় না, এমন কি তার মনে হতে লাগল সে যেন ওদের একেবারেই ভালোবাসে না।

সময় কত তাড়াতাড়িই না চলে যায়! ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ঠাণ্ডা সকাল গেছে, হিমে বার্চগাছ হলুদ হয়ে গেছে, অ্যাস্পেনে ধরেছে লাল রঙ। নদীর জল কালো হয়ে গেল আর নদীটাকেও মনে হতে লাগল আগের চেয়ে বড়, কেন না তার তীর এখন নগ্ন — তীরের গাছপালা ঝোপঝাড় দ্রুত পাতা হারাচ্ছিল। শরতের হিমেল বাতাস শুকনো পাতাগুলিকে খসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ প্রায়ই ভারী মেঘে ঢাকা, সে মেঘ শরতের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরায়। মোট কথা ভালোর লক্ষণ কমই দেখা যাচ্ছিল, আজ বেশ কিছু দিন হল বাসাবদলকারী পাখিদের দল পাশ দিয়ে উড়ে চলেছে।

প্রথম যাত্রা করল জলার পাখিরা, কেন না জলাগুলো ইতিমধ্যে জমে যেতে শুরু করেছে। সবার চেয়ে বেশিদিন থাকল হাঁস জাতীয় জলচর পাখিরা। ধূসরকণ্ঠীর সবচেয়ে বেশি দুঃখ হচ্ছিল যখন সারসেরা চলে গেল — তারা এমন করুণস্বরে আর্তনাদ করছিল যে মনে হচ্ছিল যেন ওকে তাদের সঙ্গে ডাকছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোন এক গোপন বেদনায় তার বুকের ভেতরটা

এই প্রথম মোচড় দিয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে সে দু'চোখে অনুসরণ করল আকাশের বুকে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সারসদের দলের চলে যাওয়া।

'ওদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে!' মনে মনে ভাবল ধূসরকণ্ঠী।

রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বুনো হাঁসের দলও যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে। আলাদা আলাদা কতকগুলো বাসা মিলে বিশাল বিশাল একেকটা ঝাঁক বেঁধেছে। বুড়ো আর অভিজ্ঞ পাখিরা অল্পবয়সীদের শেখাচ্ছে। রোজ সকালে এই অল্পবয়সীদের দল আনন্দে কলরব করতে করতে অনেক দূরে ঘুরে বেড়ায় — উদ্দেশ্য হল দূর পথযাত্রার জন্য ডানাগুলোকে শক্তসমর্থ করে তোলা। বুদ্ধিমান দলপতিরা প্রথমে আলাদা আলাদা একেকটি দলকে পরে সকলকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগল। কত যে চিৎকার চেঁচামেচি, কিচিরমিচির, কম বয়সী পাখিদের আনন্দ ফুর্তির কলরব...

একমাত্র ধূসরকণ্ঠীই যোগ দিতে পারছিল না ওদের এই বেড়ানোয়, সে কেবল দূর থেকে দু'চোখ ভরে দেখত তাদের ঘুরে বেড়ানো। কী আর করা যাবে? ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেই হবে! তবে হ্যাঁ, সে সাঁতার কাটত, জলের ভেতরে ডুব দিতে পারত চমৎকার। জলই ছিল তার সব।

'যাত্রা করা উচিত, সময় হয়েছে!' বুড়ো দলপতিরা বলতে লাগল। 'এখানে আর অপেক্ষা করা কেন?'

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, দ্রুত চলে যাচ্ছে। এসে গেল সেই সর্বনাশা দিনটি।

গোটা ঝাঁকটি একটা জীবন্ত পিণ্ড হয়ে জড় হল নদীর বুকে। শরতের ভোর — জল তখনও ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তিনশ' হাঁসের ঝাঁক। শোনা যাচ্ছিল কেবল বড় বড় দলপতিদের কলধ্বনি।

বুড়ি হাঁস সারা রাত ঘুমোতে পারে নি — এই শেষবারের মতো সে রাত কাটাচ্ছে ধূসরকণ্ঠীর সঙ্গে।

বুড়ি হাঁস তার মেয়েকে পরামর্শ দিল, 'ঐ যে যেখানে ঝরনা এসে নদীতে পড়ছে ঐ পাড়টার ধারে কাছে তুই থাকিস। ওখানে শীতকালের কোন সময়ই জল জমে যায় না।'

ধূসরকণ্ঠী পাখির ঝাঁক থেকে তফাতে রয়ে গেল, যেন সে বাইরের কেউ।

সকলেই দল বেঁধে ওড়ার আয়োজন নিয়ে এত ব্যস্ত যে তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছিল না। বুড়ি হাঁসের বুক টনটন করছিল বেচারি ধূসরকণ্ঠীর কথা ভেবে। কয়েকবার সে মনে মনে ভেবে ঠিক করল যে থেকে যাবে: কিন্তু কী করে থেকে যাবে যখন তার অন্য বাচ্চাকাচ্চারাও আছে, তাছাড়া উড়তে হবে সকলে মিলে দলের সঙ্গে?

'আচ্ছা, যাত্রা শুরু করা যাক!' প্রধান দলপতি হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকটা একসঙ্গে আকাশে উড়ল।

ধূসরকণ্ঠী নদীর বুকে একা রয়ে গেল, অনেকক্ষণ ধরে সে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল

দূরগামী পাখির ঝাঁক। প্রথমে সকলে উড়ল একটা জীবন্ত পিণ্ডের আকারে, তারপর সার বেঁধে একটা নিখুঁত ত্রিভুজ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

'আমি কি তাহলে একেবারেই একা?' অঝোরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভাবল ধূসরকণ্ঠী। 'আমাকে তখন খেঁকশিয়ালীতে খেয়ে ফেললেই বরং ভালো হত।'

৩

যে নদীর ধারে ধূসরকণ্ঠীকে রেখে যাওয়া হল সেই নদীটা ঘন বনে ঢাকা পাহাড়পর্বতের মধ্য দিয়ে আনন্দের কলধ্বনি করে বয়ে চলেছে। জায়গাটা নির্জন — আশেপাশে কোথাও কোন লোকবসতি নেই। সকালবেলায় তীরের কাছের জল জমে যেতে শুরু করে, আর দিনের বেলায় কাচের মতো পাতলা বরফের স্তর গলতে থাকে।

'পুরো নদীটাই কি জমে যাবে নাকি?' ধূসরকণ্ঠী ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে।

একা একা তার বড় একঘেয়ে লাগত, সব সময় সে ভাবত তার দূরে-চলে-যাওয়া ভাইবোনদের কথা। কোথায় এখন ওরা? ভালোয় ভালোয় পেঁছুতে পেরেছে ত? তাকে ওদের এখনও মনে পড়ে কি? এটা ওটা সব কিছু ভাবার মতো অঢেল সময় ছিল তার। একা থাকা কাকে বলে সে এবারে বুঝতে পারল। নদীটা ফাঁকা, প্রাণের যতটুক চিহ্ন রয়ে গেছে তা কেবল বনের ভেতরে, যেখানে বটের পাখিরা শিস দিত, কাঠবেড়ালি আর খরগোস লাফালাফি করত।

একবার বড় বেশি একা একা লাগায় ধূসরকণ্ঠী বনের ভেতরে ঢুকল, কিন্তু সেখানে গিয়ে ঝোপের তলা থেকে ডিগবাজী খেয়ে একটা খরগোসকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে বেজায় ভয় পেয়ে গেল।

'ওঃ কী ভয়টাই আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলি রে বোকাটা!' খরগোস খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর বলল। 'ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। এখানে তুই কী করছিস? সব হাঁস ত কবে উড়ে গেছে।'

'আমার ওড়ার ক্ষমতা নেই — আমি যখন খুবই ছোট ছিলাম সেই সময় খেঁকশিয়ালী আমার ডানা কামড়ে জখম করে দিয়েছে।'

'ওঃ এই খেঁকশিয়ালীর কথা কী বলব! ওর চেয়ে খারাপ জন্তু আর হয় না। আমার পেছনেও অনেক কাল হল লেগে আছে ধরবে বলে। ওর কাছ থেকে সাবধানে থাকবি, বিশেষ করে নদী যখন বরফে ঢাকা পড়ে যাবে। ঠিক সেই সময়ই ধরতে পারে।'

ওদের আলাপ-পরিচয় হল। খরগোসটাও ছিল ধূসরকণ্ঠীর মতোই অসহায়। অনবরত পালিয়ে পালিয়ে সে নিজের প্রাণ বাঁচাচ্ছিল।

'পাখির মতো আমার যদি ডানা থাকত তাহলে আমার মনে হয় দুনিয়ায় কাউকে আমি পরোয়া করতাম না! তোর ডানা না থাকলে কী হবে তুই অন্তত সাঁতার কাটতে জানিস — কিছু

ঘটলে অন্তত টুপ করে জলে ডুব দিতে পারিস,' সে বলল। 'আর আমাকে সব সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। আমার শত্রু চারধারে। গরমকালে তবু কোথাও লুকানো যায়, কিন্তু শীতকালে সব চোখে পড়ে।'

দেখতে দেখতে প্রথম তুষারপাতও হল, হিম তখনও নদীকে কাবু করতে পারছে না। রাতে যতটুকু ঠাণ্ডায় জমে যেত তার সবখানিই আবার জলের তোড়ে ভেঙে যেত। এ যেন জীবনমরণ সংগ্রাম। সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল তারাভরা, পরিষ্কার রাত, যখন চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, নদীর বুকে ঢেউ খেলে না। নদী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর এই ঘুমন্ত অবস্থায় হিম তাকে বাঁধতে চাইছে বরফের বেড়িতে।

তাইই ঘটল। নিঝুম নিস্তব্ধ তারাভরা রাত। তীরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বন, যেন দানব-প্রহরী। রাতে সচরাচর যেমন হয় — পাহাড়পর্বতকে মনে হচ্ছিল আরও উঁচু। উঁচু আকাশ থেকে চাঁদ তার কাঁপা কাঁপা আলোর ফুলকিতে সব কিছু আলোকিত করে তুলছে। দিনের বেলায় পাহাড়ী নদী উত্তাল ছিল, এখন সে শান্ত হয়ে এসেছে, হিম নিঃশব্দে গুড়ি মেরে আসছে তার দিকে, গাঢ়, গাঢ়তম আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছে অহঙ্কারী, অবাধ্য সুন্দরীকে, তাকে যেন ঢেকে দিল স্বচ্ছ আয়নার কাচে।

ধূসরকণ্ঠী আর কোন আশাভরসা দেখতে পেল না, কেন না নদীর ঠিক মাঝখানটা কেবল জমে যেতে বাকি আছে, সেখানে চারদিকে বরফজমা প্রশস্ত একটা ডোবামতন হয়েছে। তার সাঁতার কাটার মতো খালি জায়গা এখন তিরিশ মিটারের বেশি নেই।

ধূসরকণ্ঠীর দুর্দশার আর সীমা রইল না যখন নদীর পাড়ে এসে দেখা দিল খেঁকশিয়ালী— সেই খেঁকশিয়ালীটা যে ওর ডানা ভেঙেছিল।

'আরে পুরনো স্যাঙাত যে! কী খবর?' তীরে দাঁড়িয়ে পড়ে গদগদস্বরে বলল খেঁকশিয়ালী। 'অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই। শীতের অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'দয়া করে চলে যাও এখান থেকে। তোমার সঙ্গে কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার,' ধূসরকণ্ঠী উত্তর দিল।

'আমার ভালো কথার কিনা এই উত্তর! বেশ বটে তুই — আর কীই বা বলার আছে আমার! তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি, আমার সম্পর্কে লোকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে। নিজেরাই কোন একটা আজেবাজে কাজ করার পর দোষটা চাপায় আমার ঘাড়ে।... আচ্ছা, এখনকার মতো চলি।'

খেঁকশিয়ালী দূরে চলে যেতেই থপথপ করতে করতে খরগোস এসে বলল, 'সাবধানে থাকবি কিন্তু ধূসরকণ্ঠী, ও ফের আসবে।'

ধূসরকণ্ঠীও ভয়ে ভয়ে থাকতে লাগল খরগোসের মতো। এমন কি তার চারপাশে যে সমস্ত আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটছিল সেগুলোও সে আর উপভোগ করতে পারে না। আসল শীত

শুরু হয়ে গেল। তুষারধবল গালিচায় মাটি ঢাকা পড়ে গেল। কোথাও কোন কালো চাপের চিহ্নমাত্র নেই। এমন কি পাতাঝরা উলঙ্গ বার্চ অ্যালডার, উইলো আর রোয়ানগাছগুলিও রুপোলি পেঁজা তুষারকণায় সেজেছে। আর ফারগাছগুলি হয়েছে আরও জমকাল। তারা তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন গায়ে পরেছে দামী গরম পশুলোমের কোট।

বাস্তবিকই চারপাশে আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু বেচারি ধূসরকণ্ঠী জানে কেবল একটি জিনিসই — এই সৌন্দর্য তার জন্য নয়, সে কাঁপতে থাকে একটি চিন্তায় — মাঝখানের এই ছোট্ট ডোবাটা যে-কোন মুহূর্তে জমে যেতে পারে, তখন তার আর কোথাও যাবার রাস্তা থাকবে না। খেঁকশিয়ালী কয়েক দিন বাদে সত্যি সত্যিই এলো, পাড়ে বসে ফের বলতে শুরু করল:

'তোর জন্যে আমার মন কেমন কেমন করছে রে হাঁসের ছানা। বেরিয়ে আয় বলছি, নইলে আমি নিজেই তোর কাছে আসব। আমার ওসব দেমাক-টেমাক নেই বাপু।'

খেঁকশিয়ালী সাবধানে বরফের ওপর দিয়ে গুটি গুটি এগোতে লাগল সোজা মাঝখানের ডোবাটার দিকে, ধূসরকণ্ঠী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কিন্তু খেঁকশিয়ালী জলের ধারেকাছে পেঁছুতে পারল না, ওখানকার বরফ তখনও খুব পাতলা। খেঁকশিয়ালী সামনের দু'হাতের থাবায় মাথা রেখে নিজের গা চেটে বলল:

'কী বোকা রে তুই হাঁসের ছানা! বলছি বরফের ওপর উঠে আয়! যাক গে, আজ চলি। আমার তাড়া আছে।'

খেঁকশিয়ালী রোজ আসতে শুরু করল — এসে দেখে মাঝখানের ডোবাটা জমে গেছে কিনা। এদিকে হিমও এগিয়ে আসতে থাকে — সে তার নিজের কাজ চালিয়ে যায়। ডোবাটা বুজে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত থেকে গেল মোটে জানলার সমান — দু'মিটার মতন আয়তনের একটা ফোকর। বরফ ছিল শক্ত, খেঁকশিয়ালী বসে ছিল ঠিক কিনারে। বেচারি ধূসরকণ্ঠী ভয়ে ডুব দিল জলের নীচে, এদিকে খেঁকশিয়ালী বসে বসে তার দিকে মুখ বাঁকিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল:

'ঠিক আছে ডুব দে, মনের সুখে ডুব দে, যাই বলিস না কেন, আমি তোকে খাবই। বরং নিজেই বেরিয়ে আয়।'

পাড় থেকে খেঁকশিয়ালীর কাণ্ডকারখানা দেখে খরগোসের ছোট্ট বুকটা নিদারুণ ক্ষোভে ভরে ওঠে।

'ওঃ কি বেহায়া এই খেঁকশিয়ালীটা! বেচারা এই ধূসরকণ্ঠী! খেঁকশিয়ালী ওকে নির্ঘাত খেয়ে ফেলবে...' সে মনে মনে ভাবে।

৪

বরফের মাঝখানের ডোবাটা সম্পূর্ণ জমে গেলে খেঁকশিয়ালী ধূসরকণ্ঠীকে সম্ভবত খেয়েই ফেলত, কিন্তু ঘটল অন্য রকম। খরগোস নিজের ট্যারা চোখে সবই দেখল।

তখন সকাল। খরগোস খাবারের খোঁজে এবং অন্যান্য খরগোসদের সঙ্গে খেলার উদ্দেশ্যে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেজায় শীত পড়েছে, খরগোসেরা থাবায় থাবা থাবড়ে রোদে শরীর গরম করছিল। ঠাণ্ডা হলে কী হবে, মজাই লাগছিল।

'ভাইসব, সাবধান!' কে যেন চিৎকার করে উঠল।

বাস্তবিকই বিপদ নাকের ডগায়। বনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাটো চেহারার কুঁজো এক বুড়ো — শিকারী। স্কী করতে করতে চুপিসারে কখন সে এসে হাজির হয়েছে কেউ টেরই পায় নি। শিকারী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল কোন্ খরগোসটাকে গুলি করা যায়।

'হুম্, বুড়ির একটা গরম লোমের কোট হবে!' সবচেয়ে বড় খরগোসটা বেছে নিয়ে সে মনে মনে বলল।

বন্দুক তুলে সে নিশানাও ঠিক করেছে, কিন্তু এমন সময় খরগোসেরা তাকে দেখতে পেয়ে পাগলের মতো ছুটে গেল বনের ভেতরে।

'ওঃ, খুব চালাক!' বুড়ো রেগে গেল। 'দাঁড়া, মজাটা দেখাচ্ছি তোদের। আরে বোকারা, তোরা বুঝতে পারছিস না যে লোমের কোট ছাড়া বুড়ির চলবে না। বুড়ি ঠাণ্ডায় জমে যায় তাই চাস বুঝি তোরা? যতই দৌড়াস না কেন, আকিম্তিচকে ঠকানোর সাধ্যি নেই তোদের। আকিম্তিচ আরও চালাক! আর আকিম্তিচের বুড়ি তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, 'দেখো বুড়ো লোমের কোট ছাড়া যেন ফিরো না!' আর তোরা কিনা শুরু করলি ছুটে পালাতে...'

বুড়ো পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে খরগোসদের খোঁজ করার জন্য নীচের দিকে নামল, কিন্তু খরগোসের দল বনের এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে মটরদানার মতো। বুড়ো বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল। ধূর্ত খরগোসগুলোকে প্রাণভরে গালাগাল দিয়ে বিশ্রাম করার জন্য বসল নদীর পাড়ে।

'ইস্, বুড়ি, আমাদের লোমের কোট যে পালিয়ে গেল গো!' সে আপন মনে বলল। 'যাক গে, একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আরেকটার খোঁজে বেরোব।'

বুড়ো বসে বসে দুঃখ করছে, এমন সময় তাকিয়ে দেখে নদীর ওপর দিয়ে খেঁকশিয়ালী গুড়ি মেরে চলেছে, গুড়ি মেরে চলেছে ঠিক বিড়ালের মতো।

'হুঁ হুঁ, জিনিসের মতো জিনিস বটে!' বুড়ো উল্লসিত হয়ে উঠল। 'আমার বুড়ির কোটের ওপর কলার যেন আপনাআপনি সরসর করে উঠছে। মনে হচ্ছে জল পিপাসা পেয়েছে, কিংবা হয়ত মাছ ধরারই ফিকির।'

খে'কশিয়ালীটা বাস্তবিকই বুকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে বরফে ঘেরা সেই ডোবাটার ঠিক ধারে, যেটার মধ্যে ধূসরকণ্ঠী সাঁতার কাটছিল। ধারে এসে সে বরফের ওপর ওত পেতে শুয়ে রইল। বুড়ো চোখে তেমন ভালো দেখতে পেত না, তাছাড়া খে'কশিয়ালীর আড়াল পড়ায় হাঁসটাও তার চোখে পড়ল না।

'ওটাকে এমন ভাবে গুলি করা দরকার যাতে কলার নষ্ট না হয়ে যায়,' খে'কশিয়ালীর দিকে তাক করতে করতে বুড়ো ভাবল। 'কলারে বেশি ফুটো-টুটো থাকলে বুড়ি আবার গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাবে। সব কাজেই একটা না একটা কৌশল চাই, কৌশল ছাড়া ছারপোকাও মারা যায় না।'

ভবিষ্যত কলারের কোন্ জায়গাটায় গুলি করা যায় বাছতে বাছতে বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে নিশানা ঠিক করতে লাগল। শেষকালে গুড়ুম করে গুলি ছুড়ল। গুলির ধোঁয়া ভেদ করে বুড়ো দেখতে পেল বরফের ওপর কী যেন একটা ঝলক দিয়ে উঠল — সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ডোবাটার দিকে। পথে সে দু'বার পড়ে গেল, যখন ডোবার ধারে পেীছুল তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল — কলারের কোন নামগন্ধ নেই, জলে সাঁতার কাটছে কেবল ভয়ার্ত ধূসরকণ্ঠী।

'বোঝ কাণ্ড!' বুড়ো আশ্চর্য হয়ে দু'হাত ছড়িয়ে বলল। 'এই প্রথম দেখছি একটা খে'কশিয়ালী কিনা হাঁস হয়ে গেল। ধূর্ত বটে জন্তুটা!'

'দাদু, খে'কশিয়ালী পালিয়ে গেছে,' ধূসরকণ্ঠী তাকে বলল।

'পালিয়ে গেছে? হল ত বুড়ি, তোমার লোমের কলার! এখন আমি কী করি, অ্যাঁ? যা তা ব্যাপার হয়ে গেল। আর তুই, হাঁদারাম, তুই কেন এখানে সাঁতরে বেড়াচ্ছিস?'

'আমি দাদু আর সবার সঙ্গে উড়ে যেতে পারি নি। আমার একটা ডানা ভাঙা।'

'ওরে আমার বোকা! তুই যে এখানে থাকলে ঠাণ্ডায় জমে যাবি, নয়ত খে'কশিয়ালী তোকে খেয়েই ফেলবে। হুম্!'

বুড়ো বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবল, মাথা নাড়ল, তারপর মন স্থির করে বলল:

'আচ্ছা আমরা এক কাজ করলে পারি ত — আমি তোকে আমার নাতনিদের কাছে নিয়ে যাই। ওরা খুব আনন্দ পাবে। আর বসন্তকালে তুই বুড়িকে ডিম দিবি, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা করবি। ঠিক বললাম কিনা? বেশ হবে রে, বোকাটা...'

বুড়ো ধূসরকণ্ঠীকে জল থেকে তুলে এনে কোটের ভেতরে গুঁজে রাখল।

'বুড়িকে কিন্তু আমি এসব কিছুই বলব না...' বাড়ির দিকে যেতে যেতে সে ভাবল। 'ওর লোমের কোট আর সেই সঙ্গে কলার বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াক গে। বড় কথা হল নাতনিরা যা আনন্দটা পাবে...'

খরগোসেরা পুরো ব্যাপারটা দেখেছিল, তারা মজা পেয়ে হাসল। ও কিছু নয়, লোমের কোট ছাড়াই বুড়ির চলে যাবে — চুল্লির ওপরে ঠাণ্ডায় জমে যাবার কোন ভয় নেই।

নিকোলাই গারিন

বাঘ শিকারী

কোরীয় রূপকথা

বছর বিশেক আগে উত্তর হাসপিণ্ডং প্রদেশের কিল্‌চু শহরে ব্যাঘ্রশিকারী সমিতি নামে এক সমিতি ছিল। সমিতির সদস্যরা সবাই ছিল খুব ধনী লোক। এক দরিদ্র যুবক এই সমিতিতে ঢুকে তার সদস্য হবার বৃথাই চেষ্টা করে।

সভাপতিমশাই তাকে বললেন, 'তুমি নিজেকে ঠাউরেছ কী? তোমার কি জানা নেই যে গরিবমানুষ মনুষ্য পদবাচ্যই নয়? ভাগ এখান থেকে।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই যুবক নিজের এটা ওটা সব খরচ বাঁচিয়ে এমন একটা চমৎকার লোহার বর্শা বানাল যেটা আর সব শিকারীদের বর্শার চেয়েও ভালোই বলতে হয়।

একবার সমিতির সদস্যরা যখন বাঘ শিকারের জন্য পাহাড়ে যাত্রা করল তখন সেও চলল। মাঝে একটা খাতের ধারে তারা যখন বিরতি দিল তখন সে তাদের কাছে এগিয়ে এসে আরও একবার তাদের কাছে অনুরোধ জানাল তাকে নেওয়ার জন্য।

কিন্তু তারা তখন আমোদফুর্তিতে সময় কাটাচ্ছিল, গরিব লোকটাকে নিয়ে তাদের কিছুই করার ছিল না: তারা ফের ঠাট্টাতামাসা করে তাকে তাড়িয়ে দিল।

যুবক তখন বলল, 'তাহলে আপনারা এখানে থেকে আমোদফুর্তি করুন, পান করুন, আমি একাই চললাম।'

তারা তাকে বলল, 'বাঘ তোমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে এটাই যদি তোমার ইচ্ছে হয় তাহলে যাও, তাই যাও। উন্মাদ কোথাকার!'

'আপনাদের কাছ থেকে অপমানিত হওয়ার চেয়ে বাঘের কবলে প্রাণ দেওয়াও ভালো।'

এই বলে সে বনে চলে গেল। বনের ভেতরে একটা ঘন জায়গায় আসার পর সে একটা ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ দেখতে পেল। বাঘটা বেড়ালের মতো তার সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিল — কখনও লাফ দিয়ে তার কাছাকাছি এসে পড়ে, কখনও দূরে সরে যায়, শুয়ে পড়ে এবং তার দিকে তাকিয়ে ফুর্তিতে তার প্রকাণ্ড লেজটা এপাশ ওপাশ নাড়ায়।

এসব চলতে চলতে শিকারী শেষকালে প্রথামতো অবজ্ঞা দেখিয়ে চিৎকার করে বাঘকে বলল:

'এই চালালাম আমার বর্শা, ধর!'

সেই মুহূর্তেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারীর ওপর, সামনে বর্শার বাধা পেয়ে সেটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। কিন্তু তক্ষুনি শিকারী অমানুষিক শক্তিতে বর্শা ঢুকিয়ে দিল বাঘের গলার মধ্যে — বাঘ মরে পড়ে গেল মাটিতে।

ওটা ছিল বাঘিনী। এদিকে তার স্বামী, মর্দা বাঘটা এই দেখে তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এলো।

এবারে আর শিকারীকে চিৎকার করতে হল না, 'এই চালালাম আমার বর্শা, ধর!' শিকারীকে দেখামাত্র বাঘ নিজেই ভয়ংকর এক লাফ দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই বাঘটারও সামনে শিকারী সময়মতো তার বর্শা বাড়িয়ে ধরল, তারপর বর্শাটা বাঘের গলার ভেতরে চালিয়েও দিল।

দুই মরা বাঘকে সে ঝোপের ভেতরে টেনে আনল আর পথের ওপর বার করে রাখল তাদের লেজ।

তারপর ফিরে এলো পানভোজনে মত্ত শিকারীদের কাছে।

'কী হল? অনেক বাঘ মারা হল বুঝি?'

'আমি দুটো দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা আমার সাধ্যি নয়, তাই আপনাদের সাহায্য চাইতে এলাম।'

'সেই কথা বল! নিয়ে চল, দেখাও, কোথায়।'

তারা পানভোজন ছেড়ে শিকারীর পিছন পিছন চলল। পথে তারা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করল।

'কী? মরার সাধ ঘুচে গেল? তাই বুঝি আমাদের ডাকতে এলে?'

'চলুন চলুন, আস্তে,' দরিদ্র শিকারী হুকুমের সুরে বলল, 'বাঘদুটো কাছেই আছে।'

তাদের চুপ না করে উপায় ছিল না। এখন এই লোকটাই তাদের চালাচ্ছে।

'ঐ যে বাঘ,' বাঘদুটোর লেজগুলো দেখিয়ে বলল শিকারী।

তখন সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল:

'এই চালালাম আমার বর্শা, ধর।'

কিন্তু মরা বাঘদুটো নড়ল না।

এবারে দরিদ্র শিকারী বলল:

'ওরা এর আগেই একটা বর্শা ধরেছে, এখন কেবল কাজ হচ্ছে শহর অবধি ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া — আপনারাই টেনে নিয়ে চলুন।'

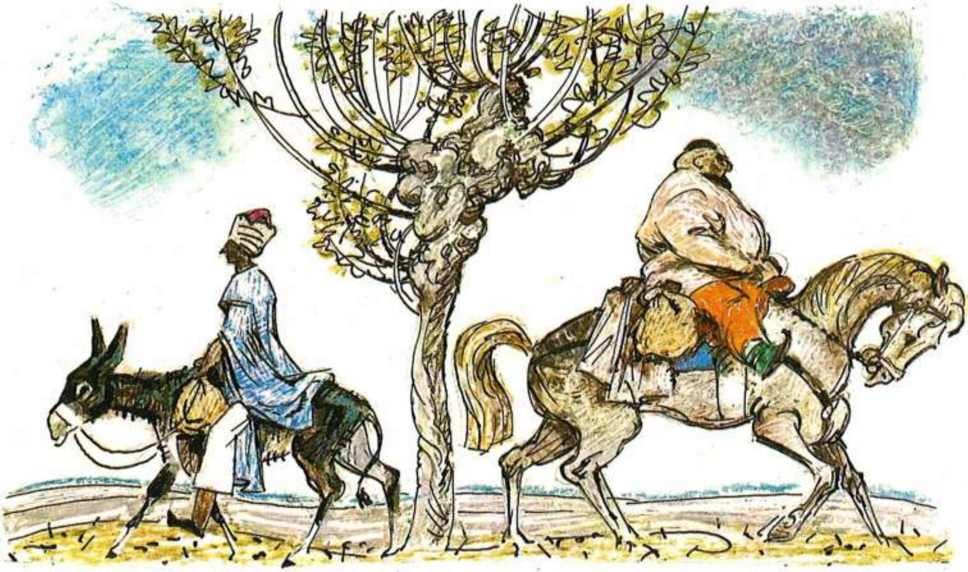

আলেক্সান্দর কুপ্রিন

কিস্মত্

প্রাচ্যদেশীয় উপকথা

অনেক অনেক বছর আগে কোন এক ছোট অথচ সমৃদ্ধ নগরে বাস করত এক সদাগর। সদাগর গালিচা, হাতির দাঁত, মশলাপাতি ও গোলাপী আতরের ব্যবসা করত। সদাগর লোকটি ছিল বুদ্ধিমান, শিষ্ট, ধার্মিক ও সৎস্বভাবের। যে রকম আদর্শ ও নিষ্ঠা নিয়ে সে তার ব্যবসা চালাত তার জন্য সকলে তাকে বিশ্বাস করত, ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

একবার শস্তা দরে বেশ কিছু পরিমাণ সোনার বালু কিনে বেশ ভালো দরে তা বিক্রি করার সুযোগ তার সামনে উপস্থিত হল। ব্যবসা সফল হলে সদাগরের সম্পদ সঙ্গে সঙ্গে তিনগুণ হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এর জন্য সদাগরের

সমস্ত নগদ টাকা এবং যত টাকা সে কর্জ দিয়েছিল তার সবটা সংগ্রহ করা ত বটেই, সমস্ত পণ্য চটপট বেচে ফেলাও দরকার। কারবারের লাভ-লোকসান দুই দিকই সে মনে মনে ভালো ভাবে হিসাব করল। কাজটা তার কাছে শেষ পর্যন্ত খুবই লাভের ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল — ভাগ্য তার ওপর নেহাৎ অপ্রসন্ন না হলে সফল না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না; তাই সদাগর তৎক্ষণাৎ সাহস করে এই ব্যবসায় তার সমস্ত সম্পত্তি খাটাবে স্থির করল।

যাবতীয় প্রস্তুতি ও বন্দোবস্তের কাজে সদাগর এক সপ্তাহ ব্যস্ত থাকল, সত্যিকারের গৃহকর্তার নীতি অনুযায়ী সে বাড়ির কাউকে এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানাল না। যে-কোন কাজ শুরুর পক্ষে শুভদিন বৃহস্পতিবার। ঐ দিন সকাল হতেই সে তার বড় ছেলেকে বলল, 'নিজের জন্যে কটা রঙের মাদি ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপা, আমার জন্যে আর বোঝা বইবার জন্যে নিয়ে আয় খচ্চর।'

কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে বাপের আজ্ঞা পালন করাই ছেলের অভ্যাস। সে তাই কোন কথা জিজ্ঞেস না করে আজ্ঞামতো কাজ করল। বাপ তাকে দুটো ছোট ছোট চামড়ার থলি দিতে ছেলে সেগুলো জিনের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে শক্ত করে আটকাল। দু'জনেই পথে নামার আগে সংক্ষেপে নামাজ সেরে নিল। দিনের আলো ফুটতে তারা বাড়ি থেকে বেরোল -- বাপ আগে আগে, ছেলে খানিকটা পেছনে, এক পাশ ধরে।

তাদের যাত্রার লগ্নটা ভালোই ছিল। বাণিজ্যের সমস্ত কাজ আর টাকাপয়সার লেনদেন এত সহজে, সংক্ষেপে আর লাভজনক ভাবে সারা গেল যে সদাগরের আশঙ্কা হতে লাগল সাফল্যটা শেষ পর্যন্ত টিকলে হয়, তাই সে প্রায়ই আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল, 'আল্লাহ্ যদি মেহেরবানি করেন,' 'খোদাতাল্লার যদি মর্জি হয়।' ভাগ্য তার ওপর প্রসন্ন হল।

পথে সে জানতে পারল ফরাসী রাজকুমারের সঙ্গে স্পেনীয় রাজকুমারীর বিয়ের দৌলতে বিলাসদ্রব্যের দাম দারুণ চড়ে গেছে। এই কারণে আশাতীত চড়া আগাম নিয়ে ব্যাকিতে মাল বিক্রি করা তার পক্ষে সম্ভব হল। তার খাতকেরা সকলেই ধনী ও সজ্জন। ঋণশোধের ব্যাপারে তাদের গরজের কোন অভাব ছিল না। পথেও কোন বাধাবিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটল না।

লেনদেনের সমস্ত বন্দোবস্ত ভালোয় ভালোয় শেষ করার পর সদাগর পথ ধরল সমুদ্রতীরের সেই সমৃদ্ধ নগরীর উদ্দেশ্যে যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল সোনার বালু। সদাগরের মন খুশিতে ভরপুর, যদিও মাঝে মাঝে কিন্তু দাড়ির ফাঁক দিয়ে সে বিড়বিড় করে বলছিল, 'ইনশাল্লা!'

সমুদ্রতীরের সেই বিখ্যাত বন্দরে পৌঁছুতে ঘোড়ার তখনও একদিনের পথ বাকি, এই সময় পথিকদু'জন খাওয়াদাওয়া ও রাতের আশ্রয়ের জন্য মোড় নিয়ে এক সরাইয়ে এসে ঢুকল। প্রথামত,

বাপ জিনে ঝোলানো থলিদুটো খুলে সঙ্গে নিয়ে কফিখানায় গেল, আর ছেলে পশুদুটোকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে তাদের পিঠের জিন খুলে দানাপানি দিল। তারপর দু'জনেই উজু করে নামাজ সারল, নামাজের পর যৎসামান্য আহার করতে বসল।

তাদের রাতের খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় কফিখানায় হৈ হৈ করে এসে ঢুকল বিশ্রী জামাকাপড় পরা পুরো এক দঙ্গল হুল্লোড়ে লোক — তাদের চেহারা কেমন যেন সন্দেহজনক। তারা মদ চাইল, পান করতে করতে গান গীত শুরু করে দিল, ফের পান করল। দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বেধে গেল, ঝগড়া চিৎকার-চেঁচামেচি, গালিগালাজ ও মারপিটের আকার ধারণ করল। ছুরির ফলা ঝিলিক দিল।

'ব্যাপার সুবিধের নয়, এখান থেকে সরে পড়তে হয়,' টেবিলের ধার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সদাগর তার ছেলেকে বলল। 'আমি তোকে জিন বাঁধতে সাহায্য করব।'

অন্ধকারের মধ্যে তারা চটপট ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে জিন চাপিয়ে পশুদুটোকে হাঁকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। সরাইখানা থেকে পায়ের দাবড়ানি, উন্মত্ত গলাবাজি যতক্ষণ তাদের পেছন পেছন ভেসে এলো, ততক্ষণ তারা দ্রুত চলতে লাগল। কিন্তু যখন নিস্তব্ধ হয়ে এলো তখন বাপ হঠাৎ খচ্চরটাকে থামাল, নিজের চারদিকে হাতড়ে হাতড়ে কী যেন দেখল, তারপর ছেলেকে হুকুম দিল, 'থাম্! পিছনে ফিরতে হবে আমাদের!'

নিজে সে অধীর হয়ে খচ্চরের মুখ ফিরিয়ে দিল, চাবুক মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিল তাকে। পিছন পিছন তার ছেলে।

ফের তারা এসে ঢুকল সরাইয়ে। কফিখানার জানলার ভেতরে উঁকি মারল, কান পেতে শুনল। সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা। আলো জ্বলছে। প্রথমে লোকজন চোখে পড়ল না। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করার পর দেখা গেল মেঝের ওপর কয়েকটি লাশ পড়ে আছে, রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে। তারা সরাইয়ের মালিক ও চাকরবাকরকে ডাকাডাকি করল। কোন সাড়াশব্দ নেই। সম্ভবত খুনজখমের ফলে ভয় পেয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে, নয়ত বনে পালিয়ে গেছে।

সদাগর ছেলের হাতে লাগাম ছুঁড়ে দিল। দ্রুত পদে দেউড়িতে উঠে ঘরের ভেতরে ঢুকল, যেখানে তারা এই কিছুক্ষণ আগেও সন্ধ্যার খানা খাচ্ছিল সেই জায়গায় এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চের ওপর ঝুঁকল — ছেলে জানলা দিয়ে দেখতে পেল বাপ বসার জায়গা থেকে দড়িতে বাঁধা তাদের চামড়ার থলিদুটো উঠিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। মাত্র তখনই ছেলে বুঝতে পারল যে তাড়াতাড়িতে তারা ঐ থলেগুলো নিতে ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সদাগর একটি কথাও বলল না। থলিদুটো জিনের সঙ্গে বেঁধে খচ্চরের পিঠে লাফিয়ে উঠল, চাবুকের লাঠি দিয়ে খচ্চরের তলপেটে গুঁতো মারল।

রাস্তার ওপর দিয়ে তারা অনেকক্ষণ তাদের ঘোড়া আর খচ্চর ছুটিয়ে নিয়ে চলল। সব সময় তাদের ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কফিখানায় সেপাই এসে পড়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পিছু ধাওয়া করে, তাদের পাকড়াও করে নিয়ে যায় কাজীর কাছে। আর কাজীর কাছে — তুমি দোষী হও আর নাই হও — শেষ কপর্দক পর্যন্ত না হারানোর আগে কোন ছাড়াছাড়ি নেই।

ভোরবেলায় তারা এসে পৌঁছুল একটা ছোট্ট নদীর ধারে। নদীর দুই তীরে বেড়ে উঠেছে তাজা গাছপালায় ঘেরা ছায়াঘন উপবন। এখানে বাপ ছেলেকে তাদের ঘোড়া আর খচ্চরকে গাছের সঙ্গে বাঁধতে বলল। তারা দু'জনে ফজরের নামাজ সারল। তারপর বাপ বলল:

'থলিদুটো নিয়ে আমার পেছন পেছন আয়।'

বনের মাঝখানে বাইরের সকলের দৃষ্টির আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে সদাগর থামল, ছেলেকে বলল, 'বোস।'

ওরা ঘাসের ওপর বসল। বাপ দুটো থলিরই বাঁধন খুলে কোন কথা না বলে ভেতরে যা যা ছিল বার করে দু'ভাগে ভাগ করতে লাগল। সব কিছু সমান দু'ভাগে — হীরে, মুক্তো, নীলা — প্রতিটি পাথরের আকার আর মূল্য বিবেচনা করে। ঐ একই ভাবে ভাগ করল স্বর্ণমুদ্রা, ধনী মুরেদের কাছ থেকে পাওয়া মহাজনী হুণ্ডিও। এই ভাগ বাঁটোয়ারা শেষ করার পর সে বলল:

'এখানে দুটো সমান ভাগ আছে। একটা তোর। যে কোন একটা ভাগ বেছে নে, সব কিছু থলের ভেতরে পুরে থলেটা জিনের সঙ্গে বাঁধ। এক্ষুনি ঘোড়ার পিঠে উঠে বোস, আমরা এ পর্যন্ত যে পথ ধরে চলছিলাম সেদিকে যাবি। পাঁচ মিনিট চলার পর দেখবি পথ দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকে মোড় নিবি। বাড়িতে যাবার এটাই সোজা পথ। মনে রাখবি এখন তুই বাড়ির কর্তা। যেমন খুশি, যেমনভাবে পারিস জীবনযাত্রা করিস, আমি তোকে কোন উপদেশ দেব না, দোয়াও করতে পারছি না। যা। প্রথম যে বসতিটা পড়বে সেখানে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত ভুলেও পিছু ফিরে তাকাবি না। আমি বহু কালের মতো বাড়ি ফিরছি না। হয়ত আর কখনই ফিরব না। যা।'

ছেলে নীরবে মন দিয়ে বাপের আজ্ঞা শুনল, বাপের পায়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে দু'চরণের মাঝখানের মাটিতে চুমো খেল, তারপর উঠে পিছনে ঘুরে ঘোড়ায় চড়ে বসল। দেখতে দেখতে গাছপালার মাঝখানে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদাগর আর তার ছেলে সম্পর্কে আপাতত এই পর্যন্ত।

* * *

কোন এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী এক জমকাল ও বিখ্যাত নগরে আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের আগের দিন। এই জন্য খুব ভোর থেকেই পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান বাদশা থেকে শুরু

'দয়া করে আমাকে বল, পিতা আমার, ছোট হোক বড় হোক — তোমার যে কোন ইচ্ছা পূরণ করে তোমার উপকারে লাগতে পারি কিনা।'

প্রসন্ন হাসিতে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল:

'তোমার সব ছেলে আর নাতিদের দেখাও, আমি তাদের দোয়া করব।'

একে একে বয়সের মর্যাদা অনুযায়ী তার দিকে এগিয়ে এলো সদাগরের চারজন বয়স্ক ছেলে, আর তিনজন তরুণ — সদাগরের নাতি। প্রত্যেকে বৃদ্ধের সামনে এসে তার দু'পায়ের মাঝখানে নতজানু হয়ে দাঁড়াল, বৃদ্ধ তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল।

এই অপূর্ব প্রাচীন আচারানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বিখ্যাত সদাগর নিজে তার আশীর্বাদ ভিক্ষা করল। বৃদ্ধ তখন তাকে কেবল আশীর্বাদই করল না, তাকে জড়িয়ে ধরে তার দু'গালে ও মুখে চুমো খেল।

তখন পরম আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে নতজানু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রান্ত সদাগর বলল:

'হে পিতা, আমি এখন সাহস করে তোমাকে যে প্রশ্ন করছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো, কিন্তু প্রশ্নটাকে অলস কৌতূহল বলে নিও না। তুমি যতক্ষণ আমার বাড়িতে আছ ততক্ষণ সব সময় আমি তোমাকে মন দিয়ে দেখছি, কিন্তু তোমার এই শ্রদ্ধা উদ্রেককারী মুখ থেকে কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না, যত দেখছি ততই বেশি করে মনে হচ্ছে এ মুখ যেন আমার বড় আপন, কোন নিকটজনের। হে পিতা, এর আগে তোমার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়েছিল বলে তুমি কি মনে করতে পার?'

'তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করব, বৎস,' বৃদ্ধ স্নেহমাখা হাসি হেসে বলল, 'আমিও তাহলে তোমাকে একটা প্রশ্ন করি: তোমার কি মনে পড়ে ছোট্ট নদীর ধারে ছায়াঘেরা সেই উপবন, গাছের গায়ে বাঁধা খচ্চর আর কটা রঙের মাদী ঘোড়া, দু'জন লোক — বাপ আর ছেলে, বনের ভেতরে একটা ফাঁকা গোল জায়গায় চামড়ার থলি থেকে হীরে জহরত আর সোনাদানা বার করে সব আধাআধি ভাগ করার দৃশ্য?'

সদাগর তখন আভূমি নত হয়ে বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার দুই চরণের মাঝখানের মাটি চুম্বন করল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বলল:

'হে আমার পরম প্রিয় পিতা, খোদাতাল্লার কী মহিমা! তিনি তোমাকে এখানে এনেছেন। এই দেখ — তোমার বাড়ি, আর এই হল আমার ছেলেপুলে আর নাতিরা —আমরা সকলে তোমারই গোলাম, তোমার দাসানুদাস।'

বাপ ছেলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল, অনেকক্ষণ তারা দু'জনেই আনন্দে অশ্রুপাত করল। আশেপাশে সকলে যারা ছিল তারাও অশ্রুপাত করল। কিছুক্ষণ যাবার পর যখন মধুর

প্রশান্তি নেমে এলো তখন সম্ভ্রান্ত সদাগর অতি বিনীত ভাবে তার বাপকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা বাবা বল দেখি সেই দিন সকালে কেন তুমি সমস্ত ধনদৌলত আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাগাভাগি করলে, কেনই বা তোমার মনে হল চিরকালের জন্য না হলেও অন্তত অনেক কালের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া উচিত, দু'জনের দু'দিকে চলে যাওয়া উচিত?'

বৃদ্ধ উত্তর দিল:

'তুই দেখলি ত, আমরা যখন আমাদের কাজে পথে বেরোলাম তখন অসাধারণ সাফল্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মনে করে দ্যাখ্ — আমি বারবার বলছিলাম 'ইনশাল্লা'। আমার ভয় হচ্ছিল পাছে ভাগ্য আমাদের ঈর্ষা করে। কিন্তু যখন আমরা সরাইতে ফিরে গিয়ে আমাদের থলিদুটো খুঁজে পেলাম, দেখলাম যে-কোন লোকের দৃষ্টির সামনে ও হাতের নাগালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেউ সেগুলো স্পর্শও করে নি, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এমন সৌভাগ্য মানুষের জীবনের যে কোন ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায়, বুঝলাম যে এর পর ন্যায়বিচার অনুযায়ী আমার ওপর অনিবার্য ভাবে নেমে আসছে সুদীর্ঘকালের অসাফল্য ও দুর্ভাগ্য। তাই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, তোকে, আর আমার বাড়িঘর দুয়ারকে আসন্ন দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি ঠিক করলাম আমার অনিবার্য নিয়তিকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাব, যেহেতু কথায় বলে: একমাত্র মূর্খ লোকই ঝড়ঝঞ্ঝার সময় আশ্রয় খোঁজে গাছের নীচে, অথচ গাছই আকর্ষণ করে বজ্রবিদ্যুৎ।... এখন তুই দেখতে পেলি ত তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর এই সময়ের মধ্যে কতদূর দারিদ্র্য ও দুর্দশা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে — তাহলে তুইই বল, আমি বিচক্ষণের কাজ করেছি কিনা।'

এই কথা শোনার পর শ্রোতারা সকলে মাথা নীচু করে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানাল, তার সূক্ষ্মদর্শিতায়, গভীর ভালোবাসার প্রেরণাবশে পরিবার ছেড়ে যাওয়ায় তারা অবাক হল।

অতিথিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধের একজন জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা তাহলে আজ তোমার শেষ সম্বল ভিখারির ঝুলিটা চুরি গেছে জানার পর কেন তুমি না কেঁদে খুশি হলে, উল্লসিত হয়ে উঠলে? আমার এই দুর্বিনীত প্রশ্নের জন্যে রাগ করবে না, যদি তোমার অভিরুচি হয় তাহলেই উত্তর দিও।'

বৃদ্ধ তাতে প্রসন্ন হাসি হেসে বলল:

'উল্লসিত হলাম এই কারণে যে ঠিক সে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার ওপর অত্যাচার করে করে ভাগ্যের বিরক্তি ধরে গেছে। নিজেই ভেবে বল দেখি, এটা কি কল্পনা করা যায় যে এই ভিখারির চেয়েও দরিদ্র ও হতভাগ্য এমন লোক আমাদের দুনিয়ায় সূর্যের আলোর

নীচে আছে যে কিনা তার কাছ থেকেও থলি চুরি করতে পারে? অদৃষ্ট এর চেয়ে খারাপ আর কিছু আমার জন্যে মাথা খাটিয়ে বার করতে পারে নি। আর সত্যিই দেখ — আমি ভুল করি নি। তাই না এই দিনই আমি সন্ধান পেলাম আমার ছেলের, তার ছেলেদের আর তাদেরও ছেলেদের? আর এখন তাদের মাথার ওপর নিজের দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপানোর কোন আশঙ্কা নেই জেনে আমি আমার বাকি জীবন ভালোবাসা, সুখশান্তি ও আনন্দের মধ্যে কাটাতে পারব।'

তার এই কথায় সকলে ফের মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন জানিয়ে সমস্বরে বলল, 'কিস্‌মত্‌!'

সূচী

আ. পুশকিন
রুস্‌লান ও ল্যুদ্‌মিলা। কাব্যাংশ · 5

স. আক্সাকভ
আলতা জবা ৭

আ. পগরেল্‌স্কি
কালোমানিক অথবা পাতালবাসী মানুষ। ছোটদের মায়াকাহিনী ৩৩

ভ্ল. অদয়েভস্কি
নস্যিদানির পুরী ৬৬

ম. লেরমন্তভ
আশিক-কেরিব ৭৪

ভ্ল. দাল্‌
বিড়াল ও খেঁকশিয়ালী ৮৫

ক. উশিন্‌স্কি
অন্ধ ঘোড়া ৯০

ল. তলস্তয়
ন্যায়বিচারক ৯৪

ভ. গারশিন
ব্যাঙের বিশ্বদর্শন (অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) ৯৮

দ. মামিন-সিবিরিয়াক
ধুসরকণ্ঠী ১০৫

ন. গারিন
বাঘ শিকারী। কোরীয় রূপকথা ১১৫

আ. কুপ্‌রিন
কিস্‌মত্‌। প্রাচ্যদেশীয় উপকথা ১১৮

ISBN 5-05-000729-1